মৌলবাদী অপপ্রচারের জবাব

প্রশ্ন : সাড়ে চার শতকেরও বেশি পুরনো বাবরি মসজিদ নামের একটি ইমারতকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে— তা নিয়ে এত হইচই করার কি আছে?

উত্তর : ঐতিহাসিক নিদর্শন হিসাবে যে কোনও স্থাপত্য শিল্প-কর্মকে আইনের মাধ্যমে রক্ষা করা আধুনিক সভ্যতার একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যে কোনও সভ্যদেশে এই নিদর্শন রক্ষা করা প্রধান কর্তব্য হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত। অতীতকে জানার, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য রক্ষা করার এ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায়। এর জন্য আন্তর্জাতিক আইনও আছে। ঐ আইন আছে আমাদের দেশেও। তৎসত্ত্বেও, শীর্ষ আদালতকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভেঙ্গে এই ঐতিহাসিক ইমারতটিকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টকে অপদস্থ করা হলো। জাতীয় সংহতি পরিষদকে করা হয়েছে তুচ্ছজ্ঞান। পৃথিবীর সামনে ভারতের মাথা হেঁট করে দেওয়া হলো। ভারতে কী বর্বর শাসন চলছে! — এই চরম অবমাননাকর প্রশ্ন ভারত সম্পর্কে বিশ্বের সমস্ত মানুষের কাছে হাজির হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হলো।

ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ রক্ষা করা বর্তমান সভ্যতার বিশেষত গত দুই শতক জুড়ে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ভারতের সংবিধানেও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ উপযুক্ত মর্যাদার সাথে রক্ষা করা হবে— এই অঙ্গীকার সুস্পষ্টভাবে রাখা হয়েছে। বাবরি মসজিদ ভেঙে এই আদর্শের মূলেও এক আঘাত হানা হয়েছে। ভারত উপ-মহাদেশের এবং বিশ্ববাসীর কাছে আমাদের গর্বের অবস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে।

চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত ঐ মসজিদটিকে সম্পূর্ণ অক্ষত রাখা হবে— ভারতের সংসদে এই আশ্বাস দিয়েছিল তখনকার প্রধান বিরোধী

দল বিজেপি। সেই আশ্বাসবাণীকে মারাত্মক বর্বরতায় লঙ্ঘন করে সংসদীয় ইতিহাসে তথা সারা বিশ্বে একটি কুৎসিত নজির তৈরি করা হয়েছে।

উত্তর প্রদেশের তদানীন্তন নির্বাচিত বি জে পি সরকার হলফনামা পেশ করে সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিল— মসজিদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে দেওয়া হবে না। এই প্রতিশ্রুতি শোচনীয়ভাবে লঙ্ঘন করেছে রাজ্য সরকার। সঙ্ঘ পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে একযোগে সরকার এই বর্বরতা সংঘটিত করে। এর দ্বারা ফ্যাসিস্টসুলভ ঔদ্ধত্যের এক চরম মাত্রায় ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করা হলো।

বাবরি মসজিদ ভেঙে দিয়ে শুধু ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষের অনুভূতিতে আঘাত দেওয়া হয়নি— হিন্দুসহ অন্য সমস্ত ধর্মের প্রকৃত ধর্মপ্রাণ ও অসাম্প্রদায়িক মানুষের অনুভূতিতেও গভীরভাবে আঘাত দেওয়া হয়েছে। ঘটনার ২৬ বছর পরও কোন অনুতাপ বিজেপি বা সঙ্ঘ পরিবারের নেই। বরং বেড়েছে আরও আস্ফালন। আদালতে এখনও এই মসজিদ-মন্দির বিতর্ক বিচারাধীন। তাসত্ত্বেও, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুপ্রিম কোর্টকে অবজ্ঞা করে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ঘোষণা করেছেন যে, আদালতের রায় যা-ই হোক না কেন, ঐ বিতর্কিত স্থানে ধ্বংস্তূপের ওপর রামমন্দির হবেই। এভাবে এই রাজত্বে দেশের ধর্মনিরপেক্ষতাই চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন।

প্রশ্ন : বাবরি মসজিদের জায়গায় কি সত্যিই কোনও রাম মন্দির ছিল?

উত্তর : ইতিহাসে এর কোনও প্রমাণ নেই। সবটাই বানানো। এটিই প্রখ্যাত ঐতিহাসিকগণের সুচিন্তিত অভিমত। রামায়ণ মহাকাব্যের আদি রচয়িতা বাল্মিকীর মহাকাব্যে তো নয়ই, এমনকি অনেক পরবর্তীকালে রচিত তুলসীদাসের রামায়ণেও এর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বীক্ষণ (আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া)-র প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল বি বি লাল এবং অতিরিক্ত জেনারেল কে ভি সুন্দর রাজন দীর্ঘকাল এ নিয়ে গভীর সমীক্ষা চালিয়েছেন। কোনও প্রমাণ পাননি। বরং ২০০৩ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট নির্দেশিত বিতর্কিত স্থানের খননকাজের অপ্রকাশিত কিছু তথ্য সম্প্রতি ২০১৯ জানুয়ারিতে সামনে এসেছে যা তখন বাজপেয়ী শাসনের সময় আদালতে পেশ হয়নি। তখনও এই রিপোর্ট নিয়ে

একপেশে বলে বিতর্ক হয়েছিল। সঙ্ঘ পরিবারের দাবি নস্যাৎ করার বেশকিছু প্রমাণ সেই বিতর্ক ও নতুন তথ্যে মিলেছে, যা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন মামলায় হয়তো আসবে।

ব্রিটিশ ভারতে সরকারী নীতিই ছিল বিভেদ সৃষ্টি। ১৮৫৭ সালে মহাবিদ্রোহ বা প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে অসাধারণ ঐক্যবদ্ধ লড়াইয়ের পর এই বিভেদের তীব্রতা বৃদ্ধির জন্য ব্রিটিশ শাসকদের পরিকল্পিত ইতিহাস-বিকৃতিকে নতুন নতুন মাত্রা দেওয়া হয়। ভারতীয় ঐতিহাসিকদের বেশিরভাগ তার দ্বারা প্রভাবিতও হয়। এই ব্রিটিশ ছকেই ১৮৬০ সালে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের রাজ কর্মচারী প্যাট্রিক কার্নেগী লেখেন যে, বাবরের আমলেই মন্দির ভাঙ্গা হয়। এই মিথ্যা ও বিকৃতিকে আজও ভর করে চলেছে হিন্দু মৌলবাদীরা। এই অনৈতিহাসিক উক্তির অন্তসারশূন্যতা ও জবাব পাওয়া যায় পরবর্তীকালের নানা গবেষণায়। [যেমন, সুনীল শ্রীবাস্তবের রচিত 'The Disputed Mosque: A Historical Inquiry']

আর যদি কোনও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়াও যেতো যে অতীতে ওখানে রাম মন্দির ছিল— তাহলেও তার উপর নির্ভর করে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ মসজিদটা উপড়ে ফেলতে হবে? এই সূত্র ধরে যদি অগ্রসর হতে হয় তাহলে মন্দির মসজিদ গির্জা বৌদ্ধস্তূপ ভাঙাভাঙির প্রতিশোধ নিতে মধ্যযুগীয় বর্বরতায় আবার ফিরে যেতে হবে। ভাবা যায় যুগ যুগ ধরে চলে আসা সতীদাহ প্রথাকে কি ভারতীয় ঐতিহ্য ধরা হবে! সতীদাহ প্রথা বর্বরতা ছিল বলে এখন কী তার পাল্টা করতে হবে! এ তো বর্বরদের অজুহাত।

প্রশ্ন : রামায়ণের নায়ক রাম কি ঐ বিতর্কিত স্থানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর : রামায়ণ আমাদের দেশের একটি মূল্যবান মহাকাব্য। রবীন্দ্রনাথও তা-ই বলেছিলেন। ধর্মমত নির্বিশেষে সকলেই এই সত্যকে স্বীকার করেন। এই মহাগ্রন্থের মূল্যবান সম্পদও আছে। কিন্তু প্রাচীনকালের ঘটনাবলীর সত্যাসত্য বিচার করতে হলে অনিবার্য কারণেই সকলকে ঐতিহাসিক এবং গবেষকদের উপর নির্ভর করতে হয়। জাতীয় অধ্যাপক আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন— "... রামায়ণ মূলত কোনও একজন কবির সাহিত্য কীর্তি, যাঁর নাম দেওয়া হয়েছে বাল্মীকি। এর পিছনে ইতিহাসের বিন্দুমাত্র কোনো প্রমাণ নেই। ভারতীয় ইতিহাসের কোনো পণ্ডিতই এখন

মনে করেন না যে রামায়ণের রাম এমন এক ঐতিহাসিক চরিত্র যাঁকে কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে চিহ্নিত করা যায়।'' সঙ্ঘ পরিবারের নেতৃবৃন্দ যা-ই বলুন না কেন তাঁরা ড. সুনীতি চট্টোপাধ্যায়ের থেকেও অধিক নির্ভরশীল নন। প্রধানমন্ত্রী মোদীসহ ওদের ভাষায় এটি একটি 'বিশ্বাস'। বাবরি মসজিদ ভাঙার জিগির তোলার সময় থেকেই বলা হচ্ছে রামের জন্মস্থান হিন্দুদের একটা বিশ্বাসের বিষয় (আর এস এস'র মুখপত্র 'অর্গানাইজার' অক্টোবর, ১৯৮৯)। কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ নেই অথচ শুধু একটি অনুভূতি বা 'বিশ্বাস'র উপর ভিত্তি করে কলঙ্কজনক ঘটনা ঘটানো হবে কোনও বিবেকবান মানুষ এটাকে সমর্থন করতে পারেন না। বিজেপি-শাসিত রাজ্যগুলির সরকারের অনুমোদিত পাঠ্যপুস্তক, আর এস এস পরিচালিত স্কুলগুলিতে এবং সঙ্ঘ পরিবারের প্রচারিত বহু পুস্তিকায় এই মন্দির রক্ষার জন্য রক্তাক্ত লড়াই এবং এমনকি ১ লক্ষ ৭৪ হাজার হিন্দুর জীবনদানের আষাঢ়ে গল্প বানানো হয়েছে। ইতিহাসের ওপর এরকম বলাৎকার একমাত্র ফ্যাসিস্ট মতাদর্শীরাই করতে পারে। সম্প্রতি ইতিহাস কংগ্রেসেও এক আর এস এস অনুগামী অধ্যাপক রামায়ণের কাহিনীগুলি সম্পূর্ণ বিজ্ঞান-নির্ভর ও সত্য বলে বর্ণনা করেছেন। রামের জন্মস্থান নির্ণায়ক আর এস এস, হিন্দুদের মালিক আর 'হিন্দু ভাবাবেগের' ঠিকেদারী সঙ্ঘ পরিবারের? মুসলিম মৌলবাদীরা একইভাবে দাবি করে তারা মুসলিম জনসাধারণের একমাত্র প্রতিনিধি। দুটোই বিপজ্জনক।

প্রশ্ন : সত্যিই কি ভারতে মুসলমান শাসকদের আমলে হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল ?

উত্তর : ধর্মীয় স্থান ভাঙচুর করা, ভিন্ন ধর্মমত দাবিয়ে রাখা কিংবা প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বংস করা ইত্যাদি প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায়। ইতিহাস বিজ্ঞান এ নিয়ে গবেষণা করে প্রচুর তথ্যপ্রমাণ হাজির করেছে। এটা এখন সর্বজনস্বীকৃত। প্রাচীন ভারতে চার্বাক দর্শনের ওপরও দীর্ঘকাল চলে এই নির্যাতন। যেভাবেই হোক এধরনের ঘটনা বর্বরতারই নামান্তর। মধ্যযুগ পর্যন্ত ভারতের মধ্যে এ জাতীয় বহু ঘটনা ঘটেছে। ধর্মীয় স্থানে গচ্ছিত সম্পত্তি হস্তগত করার জন্য বা লুটের জন্যও কখনো কখনো এ ধরনের গর্হিত কাজ করা হয়েছে। আবার কখনও স্রেফ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে এক ধর্মবিশ্বাসী মানুষ অপর ধর্মবিশ্বাসী

মানুষের ধর্মীয় স্থানের উপর এই ধরনের হামলা চালিয়েছে। ভারতে হিন্দু রাজার আমলে বৌদ্ধ ও জৈন মন্দির যেমন ভাঙা হয়েছে— তেমনি হিন্দু মন্দিরও ধ্বংস করা হয়েছে। এমনকি একই হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসী হয়েও শৈব, শাক্ত এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যারা যখন প্রাধান্য অর্জন করেছে— তখন অপর সম্প্রদায়ের ধর্মীয় স্থানের উপর সার্বিক না হলেও বিচ্ছিন্ন আক্রমণ চালিয়েছে। বাইরে থেকে আসা আর্যরাও ভারতের আদিবাসী ধর্ম সংস্কৃতির ওপর আঘাত হেনে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অভিযান চালায় শতাব্দীর পর শতাব্দীজুড়ে। এটা ঠিক, মুসলমান শাসকদের আমলেও অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব কিছুকেই আদিম যুগ বা মধ্যযুগীয় বর্বরতা হিসাবেই বিবেচনা করা উচিত। তবে একথা না বললে অন্যায় হবে যে ভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী শাসনকর্তা হয়েও অপর ধর্মমত প্রসার, ধর্মীয় স্থানকে আঘাত থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছে, এরকম নজিরও অনেক আছে। অন্যথা, ভিন্ন ধর্মের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় নির্মূলীকরণ হলে এতদিনে অন্য ধর্মের অস্তিত্বই বিপন্ন হতো।

প্রশ্ন : ভারতে মুসলমানেরাই ভবিষ্যতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে— এর লক্ষণ কি দেখা যাচ্ছে?

উত্তর : ১৯৯১-২০০১ দশকে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল ২৯.৫১ শতাংশ। ২০০১-২০১১ দশকে এই হার নেমে দাঁড়ায় ২৪.৬ শতাংশে। ১৯৯১-২০০১ দশকে হিন্দুদের বৃদ্ধির হার ছিল ১৯.৯২ শতাংশ। ২০০১-২০১১ দশকে হিন্দুদের বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১৬.৮ শতাংশে। জাতীয় গড় ১৮ শতাংশ। উভয় ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমেছে, মুসলিমদের তা অপেক্ষাকৃত একটু বেশি কমেছে। সর্বশেষ জনগণনা তথ্য অনুসারে মুসলিমদের মধ্যে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু মহিলা এক দশকে বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৩৬ থেকে ৯৫৬। হিন্দুদের ক্ষেত্রে এ সময়ে এই বৃদ্ধি ৯৩১ থেকে ৯৩৯। আয়ের সঙ্গে প্রজননের সম্পর্ক আছে। আয় বৃদ্ধি বা উন্নত আয়ের পরিবারে সন্তান সংখ্যা কম। গরিবদের জন্য সন্তান শ্রম ও আয়েরও একটা উৎস। আয় ও শিক্ষার মতো সামাজিক-আর্থিক বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হল পরিবার পিছু সন্তান সংখ্যা। সাচার কমিটির রিপোর্ট ও জাতীয় নমুনা সমীক্ষা অনুসারে সাতটি ধর্মের মধ্যে মুসলিমরা সবচেয়ে গরিব। জাতীয় পরিবার

স্বাস্থ্য সমীক্ষা অনুসারে ১৯৮১ সাল থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কমছে, হিন্দুদের চেয়ে মুসলিমদের বৃদ্ধির হার বেশি কমছে, দারিদ্রের কারণে মুসলিম মহিলাদের সন্তানধারণের ক্ষমতা কমে যাচ্ছে। সংখ্যালঘু উন্নয়নে সাচার কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হয়নি। এই সামাজিক-আর্থিক-শিক্ষাগত সুপারিশ কার্যকর হলে বর্তমান হ্রাসের প্রবণতা অনুযায়ী শীঘ্রই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার সব সম্প্রদায় ও জনসমষ্টির ক্ষেত্রে প্রায় অভিন্ন হয়ে দাঁড়াবে। এই সরকারি পরিসংখ্যান এবং জনসংখ্যা বিজ্ঞান অনুসারে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার প্রশ্নই ওঠে না। এটা এক পরিকল্পিত প্রচার যা বিশ্ব হিন্দু পরিষদ তিন-চার দশক ধরে তীব্র প্রচার করে আসছে, ঘোষিত সরকারী পরিসংখ্যান এই প্রচার নস্যাৎ করা সত্ত্বেও।

প্রশ্ন : 'তিন তালাক' কী সঙ্গত?

উত্তর : তাৎক্ষণিক 'তিন তালাক' দিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ কখনই সঙ্গত নয়। সুবিচারের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। 'সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডিবেটস্ ইন ডেভেলপমেন্ট পলিসি' ২০,৬৭১ ভাষাভাষীদের মধ্যে সমীক্ষা করে ঘোষণা করে, তাৎক্ষণিক মৌখিক তালাকের সংখ্যা মোট বিবাহবিচ্ছেদের মাত্র ০.৩ শতাংশ। অর্থাৎ একেবারেই নামমাত্র। তা-ও হওয়া উচিত নয়। 'তিন তালাক' নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট এভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ নিষিদ্ধ করে ন্যায্য রায় দিয়েছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই দেওয়ানী বিরোধকে অপরাধমূলক বিরোধ হিসেবে গণ্য করে মোদী সরকার ফৌজদারী আইনের জন্য সঙ্গে সঙ্গে অর্ডিনান্স করে, পরে লোকসভায় এই অর্ডিনান্স পাশ করায়। রাজ্যসভায় পাশ না হওয়ায় ফের অর্ডিন্যান্স জারি করে। এর ফলে মুসলিম মহিলারা আক্রান্ত হবে, মুসলিম পুরুষরাও আক্রান্ত হবে। এ ধরনের প্রচেষ্টা এককথায় অগণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত।

প্রশ্ন : একজন মুসলমান পুরুষ ৪টি পর্যন্ত স্ত্রী রাখতে পারে— এই ধর্মীয় অনুমতি আছে। হিন্দুদের তা নেই। এর ফলে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ থেকে যাচ্ছে— এটা কী অস্বীকার করা যাবে?

উত্তর : সমীক্ষায় দেখা যায় মুসলিম পুরুষদের মধ্যে বিবাহের বয়স হিন্দুদের চেয়ে কম, খ্রীস্টানদের চেয়ে হিন্দুদের কম। মুসলিম মহিলা পিছু গড় সন্তান ৩.১, হিন্দু মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.৭ এবং খ্রীস্টানদের ক্ষেত্রে ২.৩। এই

পরিসংখ্যানে মুসলিম চার-স্ত্রী কী আদৌ বাস্তব? পুরুষদের চেয়ে মহিলা সংখ্যা হাজার পিছু কম। চার-স্ত্রী কি ধোপে টেকে? তাও মুসলিম মৌলবাদীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে বহুবিবাহ জারি রাখতে চায়। পশ্চাদগামী ভাবধারা কোন ক্ষেত্রেই সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রাচীন ভারতে বহুবিবাহে কড়াকড়ি কিছু ছিল না। তবে সব সম্প্রদায়ের ধনী, সম্ভ্রান্ত ও রাজা মহারাজা সম্রাটদের মধ্যে ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের কারণে বহুবিবাহের প্রচলন ছিল। ব্রিটিশ ভারতেও এই অংশের মধ্যে তার প্রচলন ছিল। একমাত্র ১৯৫৬ সালে সঠিকভাবেই এক বিবাহ প্রথা আইন হয়। বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় মুসলিম ও গোয়াতে হিন্দুদের জন্য ব্যতিক্রম ছিল। ২০০৫-২০০৬ জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষায় দেখা যায়, মহিলাদের মধ্যে মাত্র ২ শতাংশ রিপোর্ট করেছে যে, সে ছাড়াও তাদের স্বামীর অন্য স্ত্রী আছে। সব ধর্মের সন্তানহীন মহিলাদের স্বামীদের একটা ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হলেও একাধিক স্ত্রী রাখার একটা প্রবণতা দেখা যায়। এই সমীক্ষায় দেখা যায়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একাধিক পত্নী জনসংখ্যার মধ্যে শতাংশ হার হলো : হিন্দু - ১.৭, মুসলিম - ২.৫ এবং খ্রীস্টান - ২.১। উত্তর-পূর্ব, দক্ষিণ ভারত, পূর্বাঞ্চলে বহু বিবাহ অপেক্ষাকৃত বেশি।

সামাজিক-আর্থিক অবস্থা, শিক্ষার উন্নতি হলে পরিবার পরিকল্পনা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় পরিণত হয়। পরিবার পরিকল্পনার ওপর কোন নিষেধাজ্ঞা ইসলাম ধর্মে নেই। কিন্তু মুসলিম মৌলবাদীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে পরিবার পরিকল্পনার বিরোধিতা করে। অথচ পিছিয়ে পড়া অংশের আর্থ-সামাজিক উন্নতির দাবিতে তারা জোরালো নয়, হিন্দু মৌলবাদীরাও এ প্রশ্নে নীরব থাকে। আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কোন মৌলবাদীদেরই এজেন্ডা নয়। হালে সাধু সন্তরা সংসদে নির্বাচিত হচ্ছে, সঙ্ঘ পরিবারের শীর্ষ ব্যক্তিদের এমন কি নরেন্দ্র মোদীও মুসলিম-বিরোধী কদর্য প্রচারকেই তারা প্রতিধ্বনিত করে যে 'পাঁচ বিবি, পঁচিশ সন্তান' অথচ বাস্তব তথ্য ও প্রকৃত অবস্থার সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র মিল নেই। সংস্কার প্রয়োজন হিন্দু বিবাহ আইনেও। গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে সংসদে হিন্দু বিবাহ আইন করার সময় সংস্কারে বাধা দিয়েছিল হিন্দু মৌলবাদীরা। সেই সংস্কারও প্রয়োজন, যাতে খাপ পঞ্চায়েত ইত্যাদি মাথা তুলতে না পারে। বহু বিবাহ, বাল্য বিবাহ, পণ প্রথা, শিশু শ্রম, কন্যা সন্তানের প্রতি অবজ্ঞা ইত্যাদি আইনত নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সমাজে সব সম্প্রদায়ে তার প্রকোপ যথেষ্ট রয়ে গেছে। কেবল আইনে এর সমাধান

সম্ভব নয়। সামাজিক-রাজনৈতিক সদিচ্ছা, রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে আর্থ সামাজিক বিকাশ এবং সচেতনতা বৃদ্ধি প্রয়োজন। পুনরুজ্জীবনবাদী ও পশ্চাদমুখী মৌলবাদীদের দ্বারা একাজ অসম্ভব।

তবে বহু বিবাহ প্রথা আধুনিক সমাজে মোটেই কাম্য নয়— তা যে সম্প্রদায়ের মধ্যেই হোক না কেন। তেমনি হিন্দু ধর্মের মধ্যেও খাপ পঞ্চায়েত, জাত-ধর্ম বিদ্বেষ, মহিলাদের প্রতি পদে পদে বৈষম্য, বিধবাদের প্রতি নৃশংস আচরণ, পণজনিত নিপীড়ন, সতীদাহ প্রথার অবশেষ প্রভৃতি সম্পূর্ণ প্রগতিবিরোধী। এরও অবসান হওয়া উচিত।

প্রশ্ন : ভারতে মুসলমানদের অতিরিক্ত সুযোগ দিয়ে 'তোষণ' করা হচ্ছে— এ কথা কি ঠিক?

উত্তর : ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য অনুসারে মুসলিমদের মধ্যে নিরক্ষর সবচেয়ে বেশি ৪২.৭ শতাংশ, হিন্দুদের মধ্যে ৩৬.৪ শতাংশ, খ্রীস্টানদের মধ্যে ২৫.৬ শতাংশ। হিন্দুদের ৫.৯৮ শতাংশ, মুসলিমদের ১৩.৮ শতাংশ স্নাতক। উচ্চশিক্ষায় ভর্তির জাতীয় গড় ২৩.৬ শতাংশ, মুসলিমদের ১৩.৮ শতাংশ, তপসিলী জাতিদের ১৮.৫ শতাংশ এবং আদিবাসীদের মধ্যে ১৩.৩ শতাংশ। ভর্তির বয়স ধরা হয় ১৮ থেকে ২৩ বছর। অর্থাৎ মুসলিম, তপসিলী, আদিবাসীরা স্বাধীনতার সাত দশক পরেও পিছিয়ে।

তোষণ করলে এ দুরবস্থার মধ্যে কি ওদের থাকতে হতো ? শুধু গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কথা নয়— সমাজের কোনও এক অংশকে পশ্চাৎপদ রেখে সমাজের সামগ্রিক অগ্রগতি কখনই সম্ভব নয়। সে জন্য জাতীয় অগ্রগতির স্বার্থে সমাজের সকল পিছনে পড়া মানুষের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। সাচার কমিশনের সুপারিশেও ধুলো জমছে। যা হয়নি সে দিকে নজর দেওয়া সঙ্গত। সমবিকাশ নিশ্চিত হলে বিশেষ কোন সুযোগ দিতে হয় না। দেশের সার্বিক উন্নয়নের স্বার্থেই সংবিধানে সব বৈষম্যের অবসানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কার্যত অগ্রগতি তেমন হয়নি।

প্রশ্ন : হজ যাত্রার জন্য মুসলমান তীর্থযাত্রীদের কি সরকারি তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্য করা হয়?

উত্তর : হজ যাত্রীদের কোনও আর্থিক সাহায্য সরকারের পক্ষ থেকে করা হয় না। বিদেশে গিয়ে যেহেতু হজ করতে হয় এবং হজ যাত্রীদের সংখ্যাও যেহেতু

উল্লেখযোগ্য সে জন্য হজ যাত্রীদের জন্য কয়েকজন সরকারি আধিকারিক যান। তবে এর খরচ বাবদ প্রত্যেক হজ যাত্রীর নিকট হতে আনুপাতিক অর্থ আদায় করা হয়। আর বিদেশে তীর্থ যাত্রীদের খরচের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা তাদের নিকট বিক্রি করা হয়।

সেই সাথে এ কথাও মনে রাখা উচিত যে বহু মানুষের সমাগমের কারণে, কুম্ভ মেলা, গঙ্গাসাগর মেলা, তীর্থযাত্রা প্রভৃতির ব্যবস্থাপনার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ভালোরকমের অর্থ ব্যয় করতে হয়।

প্রশ্ন : এ দেশের নাগরিক হয়েও ভারতের প্রতি মুসলমানদের পরিপূর্ণ আনুগত্য নেই— এই কথার কি কোনও ভিত্তি আছে?

উত্তর : এই কথার আদৌ কোনও ভিত্তি নেই। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁরা যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন তার বহু নজির আছে। পাকিস্তানের সাথে একাধিক যুদ্ধে ভারতীয় মুসলমান সেনানীরা যে অসম সাহসিকতা ও শৌর্যের পরিচয় দিয়েছেন তার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। ভারতে সেরা সামরিক সম্মান হলো পরম বীর চক্র। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে অবদানের জন্য এই উপাধি পান আব্দুল হামিদ। ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধে এবং পরবর্তী স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুদের সঙ্গে মুসলমানদের অবদানও অবিস্মরণীয়। যে আর এস এস এই প্রশ্ন তুলে যাচ্ছে, তাদের কোন অবদান নেই স্বাধীনতা সংগ্রামে। দেশ ও মানব সেবায় অনেক নজির ও অবদান বিভিন্ন ক্ষেত্রে রয়েছে সব সম্প্রদায়ের মানুষের। তবে সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই মৌলবাদী, গোঁড়া, বিভেদ-বিদ্বেষের শক্তি ও মানুষ থাকতেই পারে। যদি কেউ ভারতে থেকে ধর্মীয় কারণে পাকিস্তানের প্রতি অধিক দরদ দেখায় কখনই তা সমর্থনযোগ্য হতে পারে না। যে কোনো ধর্ম বিশ্বাসী মানুষ ভারতীয় নাগরিক হয়েও যদি দেশের ধর্মনিরপেক্ষতা ও অসাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে— তাদের কোনও ক্ষমা নেই। ভারতের স্বার্থসংশ্লিষ্ট গোপন তথ্য বিদেশে পাচারে যারা অভিযুক্ত হয়েছে তারা হিন্দু। বিদেশে যারা কালো টাকার পাহাড় বানিয়েছে, যারা ব্যাঙ্কের হাজার হাজার কোটি টাকা লোপাট করে বিদেশে ঘাঁটি গেড়েছে, তারা হিন্দু কি মুসলমান সেটা বড় কথা নয়, এরা এককথায় দেশবিরোধী। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী না হলে সত্যিকারের দেশপ্রেমিক হওয়া যায় না, এটা স্বাধীনতা সংগ্রামেরই চিরন্তন শিক্ষা।

প্রশ্ন : মুসলমানদের জন্য পৃথক পারিবারিক আইন থাকবে কেন— অভিন্ন দেওয়ানি বিধি (কমন সিভিল কোড) চালু হবে না কেন?

উত্তর : ভারতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের জন্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে পৃথক পারিবারিক বিধি আছে। কিন্তু অন্যান্য যাবতীয় আইন ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সমভাবে বলবৎ আছে। মুসলমান, খ্রিস্টান, পার্শী, ইহুদি প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাসী মানুষের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পারিবারিক আইন আমাদের দেশে প্রচলিত আছে। এমনকি হিন্দুদের মধ্যেও স্থান ও সম্প্রদায় ভেদে বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিগত আইন (পার্সোনাল 'ল') চালু আছে। ভারতীয় সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে আছে সকল নাগরিকের জন্য একই দেওয়ানি বিধি (কমন সিভিল কোড)। সুপ্রিম কোর্টও এই সাংবিধানিক নির্দেশকে রক্ষা করে। কিন্তু তার জন্য বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এর উপযোগী সচেতনতা সৃষ্টি করার উদ্যোগ নিতে হবে। হিন্দু কোড, হিন্দু বিবাহ আইন, হিন্দু যৌথ পরিবার আইন প্রভৃতিতে এমন কিছু সংস্থান আছে যা হিন্দু মহিলাদের স্বার্থবিরোধী। তারও পরিবর্তন করা উচিত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা ভালো যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের যে পারিবারিক আইন আছে— তা তাদের ধর্মাবলম্বীদের মধ্যেই বিবাহ-বিধি নিয়ন্ত্রণ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ণয়, দত্তক গ্রহণ প্রভৃতি সংক্রান্ত। সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতিতে সরকারের পালনীয় শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সব বৈষম্যের অবসান ইত্যাদি বহুবিধ নীতি প্রণীত হয়। সাত দশকে সরকার কর্তৃক তা অগ্রাধিকার পায়নি, বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সংবিধানের ৪৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধির জন্য সরকার চেষ্টা করবে। বিতর্কের পর আম্বেদকর বলেন, এই বিধি বাঞ্ছনীয়, তবে এখন তা থাকবে স্বেচ্ছামূলক। অর্থাৎ সব অংশের মানুষের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি এবং লিঙ্গ, জাত, ধর্ম, সম্প্রদায় ইত্যাদি বৈষম্যের অবসানের মধ্য দিয়ে সকল নাগরিকদের জন্য অভিন্ন দেওয়ানী বিধি চালু করতে হবে।

তা সত্ত্বেও সারা দেশে বৈশিষ্ট্য-বৈচিত্র্যকে মর্যাদা দিয়ে সমস্ত আইন-কানুন সর্বক্ষেত্রে একই হওয়া উচিত এবং প্রচলিত আইন-কানুনে যে প্রগতি-বিরোধী ধারাগুলি আছে তারও পরিবর্তন করা উচিত। তবে এ ক্ষেত্রে সরকার ও সামাজিক সংগঠনগুলির পক্ষ থেকে আইনী জোরজবরদস্তি কিছু না খাটিয়ে মানুষের চেতনা বৃদ্ধির ওপরেই বেশি জোর দেওয়া সঙ্গত। নির্দেশাত্মক

নীতির অন্য ধারাগুলি কার্যকর করার দাবিও সব অংশের মানুষের এবং তা সম্পূর্ণ সঙ্গত। বর্তমান সরকারের আমলেই ল' কমিশন লক্ষাধিক মতামত নিয়ে এক্ষুনি একই বিধি বলবৎ না করে জোর দিয়েছে লিঙ্গ বৈষম্যের অবসান ঘটানো, সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠা এবং লিঙ্গ সমতার মাধ্যমে পারিবারিক আইনগুলিকে শক্তিশালী করার ওপর।

প্রশ্ন : মুসলমানপ্রধান রাজ্য কাশ্মীরের জন্য সংবিধানের বিশেষ ধারা— ৩৭০ অনুচ্ছেদ থাকবে কেন?

উত্তর : স্বাধীনতার আগে শতাধিক বছর ধরে কাশ্মীর বহু রকমের ঘটনার সাক্ষী। রাজন্যশাসিত এলাকাগুলির মধ্যে কাশ্মীর অন্যতম যেখানে ব্রিটিশদের প্রত্যক্ষ শাসন ছিল না। কাশ্মীরে রাজন্যশাসিত সরকারের বিরুদ্ধে ১৯৩১ সালে বিদ্রোহের পর ১৯৩২ সালে মুসলিম কনফারেন্স নামে প্রথম রাজনৈতিক দল গঠিত হয় যার প্রধান ছিলেন আব্বাস এবং সভাপতি শেখ আবদুল্লাহ। এই দল কাশ্মীরের জনগণের কাছে বিরাগভাজন ডোগরা রাজত্বের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকার করে। এই দলের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রতিবাদ জানিয়ে মহম্মদ আলি জিন্নাহর হস্তক্ষেপ সত্ত্বেও ১৯৩১ সালে শেখ আবদুল্লাহ সব নিপীড়িত মানুষের পক্ষে লড়াইয়ের জন্য 'অসাম্প্রদায়িক' ন্যাশনাল কনফারেন্স দল গঠন করেন। দেশভাগের যখন আলোচনা ওঠে তখন মুসলিম কনফারেন্স পাকিস্তানের সঙ্গে কাশ্মীরের সংযুক্তির দাবি তোলে। ন্যাশনাল কনফারেন্স সে পথে যায়নি। ভারত দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হলে মুসলিম প্রধান কাশ্মীরের কী হবে? আর এস এস এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের পৃষ্ঠপোষিত মহারাজা হরি সিং-এর কাছে দুটি পথ খোলা; এক : ভারত বা পাকিস্তানে না গিয়ে স্বাধীন থাকা; দুই : ভারত বা পাকিস্তানের সঙ্গে সংযুক্ত হওয়া। জম্মু ও কাশ্মীর হিন্দু রাজ্যসভা এবং অন্যান্যরা যেমন বলরাজ পুরী (যিনি পরে আর এস এস'র জনসঙ্ঘ দলের নেতা হয়েছিলেন) স্বাধীন হিন্দুরাষ্ট্র কাশ্মীরের পক্ষে দাঁড়িয়ে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন। তীব্র বিদ্রোহে মহারাজা হরি সিং-র রাজত্ব টলমল করছিল। ১৯৪৭ সালের ২২শে অক্টোবর জম্মুর পুঞ্চ এলাকা থেকে এবং পাকিস্তান অংশের আদিবাসীরা বরামুল্লা দখল করে নেয়। চারদিন বাদে অসহায় ও কোনঠাসা মহারাজা হরি সিং ভারতে

যুক্ত হবার জন্য অনুরোধ করলে ও সম্মতি দিলে ভারত সরকার ভারতীয় সৈন্যদের শ্রীনগর পাঠিয়ে হানাদারদের হঠিয়ে দেয়। সরকার ও ন্যাশনাল কনফারেন্সের দীর্ঘ আলোচনার ভিত্তিতে ভারতের সঙ্গে সংযুক্তি হয়, অঙ্গীভূত হবার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং কাশ্মীরের বিশেষ ভৌগোলিক, আর্থিক ও ঐতিহাসিক বৈচিত্র্য বিবেচনা করে সংবিধানের ৩৭০ ধারার শর্তে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার দেখবে প্রতিরক্ষা, মুদ্রা, যোগাযোগের ব্যবস্থা ও বিদেশ সংক্রান্ত বিষয় এবং কাশ্মীরের থাকবে নিজস্ব সংবিধান। শেখ আবদুল্লাহ নানা চাপ সত্ত্বেও কাশ্মীরকে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতেরই অঙ্গীভূত করার পক্ষে দাঁড়ান। প্রধানমন্ত্রী নেহরু ব্যাখ্যা করেছেন এই চুক্তির তাৎপর্য। এই চুক্তির পর চুক্তির বিরুদ্ধে জনসঙ্ঘ ও তার সভাপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ভারতের সঙ্গে কাশ্মীরের পূর্ণ সংযুক্তির দাবি তোলেন। নেহরু জবাবে বলেন, কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সংযুক্তি চাপিয়ে দেওয়া যায় না; আইনের ধারা দিয়েও তা করা যায় না, প্রকৃত সংযুক্তি মনপ্রাণ থেকেই আসবে। শেখ আবদুল্লাহ কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী হন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকেও আবদুল্লাহ জবাব দেন, যে মন্ত্রিসভায় ৩৭০ ধারা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়, সেই মন্ত্রিসভায় আপনিও সিদ্ধান্তের অংশীদার ছিলেন।

গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ড, হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের হাতে কাশ্মীরের হত্যাকাণ্ড ও সাম্প্রদায়িক বিভেদ-বিদ্বেষ বৃদ্ধির পরিস্থিতিতে শেখ আবদুল্লাহ শঙ্কিত হয়ে ওঠেন যা বাইরেও প্রকাশ পায়। ভারত সরকার এর রাজনৈতিক সমাধানের পথে না গিয়ে ১৯৫৩ সালে শেখ আবদুল্লাহকে বিনা বিচারে গ্রেপ্তার করে ও ১৭ বছর আটক রাখে। তারপরেই ঘটতে থাকে কাশ্মীরে প্রহসনের নির্বাচন। এ সময়ে কাশ্মীরের জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করতে পাকিস্তানী শাসকরাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিচ্ছিন্নতার শুরু এখানে, বৃদ্ধি পায় স্বায়ত্বশাসনের অধিকার খর্ব হওয়ার, পরপর নির্বাচনে রিগিং, সরকার উৎখাত, কংগ্রেসের পছন্দের সরকার চাপানো, বিনা বিচারে নেতাদের আটক, কাশ্মীরী পণ্ডিতদের ওপর নৃশংসতা ও বিতাড়ন, সামরিক বাহিনী ও নিরাপত্তা বাহিনীর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও অপরাধীদের শাস্তি না হওয়া ইত্যাদি অসংখ্য ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে ৩৭০ ধারা কার্যকর না করে কেন্দ্র তার হাতে ক্ষমতা ক্রমাগত কুক্ষিগত করে। রাজ্যপাল হিসাবে (১৯৮১-

১৯৮৪) বি কে নেহরু ১৯৯৭ সালে তাঁর স্মৃতিচারণায়ও এসব ঘটনার উল্লেখ করে কাশ্মীরের হৃদস্পন্দনকে উপেক্ষা করার জন্য আক্ষেপ করেছেন এবং লিখেছেন, '১৯৫৩ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন দিল্লিরই মনোনীত'। সম্পূর্ণ রিগিং ও প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে কংগ্রেস দলের মনোনীত প্রতিনিধি বারবার বিরাট ভোটে জয়ী হন। ১৯৯৮-২০০২ বিজেপি পরিচালিত এন ডি এ রাজত্ব কাশ্মীর পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটায়। পারমানবিক বোমার পরীক্ষা করে যুদ্ধ-জিগীর তুলে পাকিস্তানের সঙ্গেও সম্পর্কের আরও অবনতি ঘটায়। ভয়ঙ্কর অবস্থার মধ্যে ২০১০ সালে কেন্দ্রীয় সরকার কাশ্মীরে সংসদীয় এক রাজনৈতিক প্রতিনিধিদল পাঠায়। তাদের সুপারিশও কার্যকর হয়নি। মূল বিষয় : কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা স্বীকার করে নেওয়া এবং কাশ্মীরের জনগণের তাদের নিজস্ব সত্তা সম্পর্কে আস্থা তৈরি করার আশ্বাস দেওয়া; সর্বোচ্চ স্বায়ত্বশাসনের অধিকার দানের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক কাঠামো তৈরি করা, পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাতে পদক্ষেপ, কাশ্মীরের জনগণ নিজেদের মতামত ব্যক্ত করতে পারে ও মর্যাদার দাবি এরকম শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে ভারতের সব গণতান্ত্রিক শক্তির এগিয়ে আসা, কাশ্মীরের সামরিকীকরণ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বন্ধ করা। এবং সর্বোপরি, কাশ্মীর সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান। কাশ্মীরের জনগণের সঙ্গে শত্রুতাপূর্ণ মনোভাব গোটা দেশের ঐক্য-সংহতির কাছে মারাত্মক ক্ষতিকর। পুরানোটা বাদ দিয়ে স্বায়ত্বশাসন সুনিশ্চিত করতে নতুন ৩৭০ ধারার জন্য সর্বসম্মত একটা খসড়া প্রণয়নের দিকে কাশ্মীরের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলও যায়নি। মোদী সরকার সাড়ে চার বছরে হাঁটছে সম্পূর্ণ উল্টো পথে। তৈরি হয়েছে আরও বিস্ফোরক অবস্থা। সামরিক বা পুলিশী শাসনই কার্যত চলছে কাশ্মীরে। ফেব্রুয়ারিতে সন্ত্রাসবাদী হামলায় ভারতীয় জওয়ানদের হত্যাকাণ্ড অবস্থার আরও অবনতি ঘটিয়েছে, এ ঘটনা ভারত ও কাশ্মীরের জনগণের বিরুদ্ধেই সন্ত্রাসবাদীরা সংঘটিত করেছে। ৩৭০ ধারা বাতিল ও ভারতের মধ্যে কাশ্মীরের ন্যায্য স্বায়ত্বশাসনের চিরন্তন দাবির বিরোধিতা করার মধ্য দিয়ে সঙ্ঘ পরিবার বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলির হাতে হাতিয়ার তুলে দিচ্ছে এবং কাশ্মীরের জনগণকে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কবলে নিক্ষেপ করছে।

প্রশ্ন : হিন্দু-প্রধান ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করতে আপত্তি কিসের?

উত্তর : সভ্যতার অগ্রগতি ও গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের চরিত্র বদল হয়ে যাচ্ছে। এখনও কয়েকটি যে ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র বিশ্বে আছে, কার্যত তা স্বৈরাচারী রাষ্ট্র হিসাবেই বিবেচিত হয়।

আমাদের দেশে ২০১১ সালের জনগণনা রিপোর্ট অনুসারে ১২১ কোটি মানুষের মধ্যে ৯৭ কোটি হিন্দুর বসবাস আছে। আর তার সাথে আছে প্রায় ১৭ কোটি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ এবং বাকি ৭ কোটি খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, পার্সী, ইহুদি প্রভৃতি ধর্মবিশ্বাসী মানুষ। ভারতে প্রত্যেক ধর্মাবলম্বী মানুষের জীবনযাপনের অধিকার, সম্পত্তি অর্জন করার অধিকার, স্বাধীনভাবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন করার অধিকার, ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার, চিন্তার অধিকার, মতপ্রকাশের অধিকার— সমান। আইনের চোখে সকল ধর্মাবলম্বী মানুষই সমান। এখানে কোনও বৈষম্য থাকা উচিত নয়। রাষ্ট্র কোনও ধর্মীয় আচরণে বাধা দেবে না। কোনও ধর্মের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা দেখানো বা বিশেষ সুযোগ দেওয়া— তা'ও করবে না। রাষ্ট্র ধর্ম থেকে পৃথক থাকবে। রাজনীতির সঙ্গেও ধর্মকে মেশানো যাবে না। এর নামই ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। বিশ্বের মানব ইতিহাসের অগ্রগতির বহু পথ পেরিয়ে রাষ্ট্র আজ এই সংজ্ঞায় পৌঁছেছে। ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রের ধারণা থেকে সংবিধান আমূল পাল্টে দিয়ে এই ধারণা সম্পূর্ণ পৃথক। দু'টি সংজ্ঞা পরস্পর বিরোধী। কাজেই এখান থেকে ভারতীয় রাষ্ট্র এক সম্প্রদায়ের ধর্মীয় রাষ্ট্র হলে পিছিয়ে যাবে— তা কখনোই অনুমোদন করা যায় না। মানা যায় না ইতিহাসের চরম বিকৃতিও। হিন্দু নামে কোন শব্দ বা হিন্দু বলে কোন ধর্মের চিহ্ন বেদ বা প্রাচীন ভারতীয় ধর্মশাস্ত্রগুলিতে নেই; আধুনিক ভারত রাষ্ট্রের মতো অতীতে কোন অখণ্ড ভারত রাষ্ট্রও ছিল না। হিন্দুধর্ম কথাটা এখন চালু। প্রশ্ন তার প্রাচীনত্ব নিয়ে। ঐশ্লামিক রাষ্ট্রে যেমন একই সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংস্রতম হানাহানি বন্ধ হয় না, সব ধর্মীয় রাষ্ট্রেও একই পরিণতি। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য নির্মূল হবে কিনা— এ বিতর্ক এড়িয়ে যায় সব মৌলবাদীরা।

রাষ্ট্রের সাথে ধর্মের নাম জুড়ে দিলেই সেই ধর্মাবলম্বী মানুষের মঙ্গল হবে এবং দমন পীড়নের অবসান হবে— এর থেকে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা আর কিছু হতে পারে না। ঐশ্লামিক রাষ্ট্রগুলিই তার সাক্ষী। বহু মানুষের জীবন ও

রক্ত দিয়েও ইসলামিক রাষ্ট্র নাগরিকদের তো নয়ই, এমনকি সেই ধর্মবিশ্বাসী মানুষের অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অনগ্রসরতা দূর করতে পারেনি। আলজিরিয়া ও আরব রাষ্ট্রগুলি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। একই ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ অন্যের ওপর শোষণ-নির্যাতন করে না— এটা যে সম্পূর্ণ মিথ্যা, পৃথিবীর চারদিকে তাকালেই তা জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায়।

রাষ্ট্র পরিচালনা করা আর ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালন করা দু'টি সম্পূর্ণ পৃথক বিষয়। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকটতর। জনগণের জীবনজীবিকার সমস্যা মারাত্মক রূপ নিয়েছে। গণতন্ত্র ও মানুষের মৌলিক অধিকার গুরুতর আক্রান্ত। রাষ্ট্রের পরিচালনার ব্যর্থতাকে ঢাকার জন্য কিংবা অন্ধ আবেগ সৃষ্টি করে মানুষের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য রাষ্ট্রের সাথে ধর্মকে যুক্ত করার চেষ্টা করা হয়। ভারতে এই ধ্বংসাত্মক প্রচেষ্টাকে কখনই সফল হতে দেওয়া যায় না। সংবিধান পরিবর্তন করে ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র করার শ্লোগান প্রচণ্ড ভয়ঙ্কর এবং দানবীয়।

বিজেপি বলছে তাদের হিন্দুত্বের ধারণাই প্রকৃত ধর্মনিরপেক্ষতা। এর থেকে অসত্য কথা আর কিছু হতে পারে না। ৮০ শতাংশ হিন্দুকে সাম্প্রদায়িক হিন্দুত্বের বলয়ে তারা নিয়ে আসছে চায়। মুসলিম মৌলবাদীরা জনসাধারণকে সাম্প্রদায়িক আবর্তে আবিষ্ট করতে তৎপর। তারা আসলে গণতন্ত্র, মানবাধিকার, সামাজিক সুবিচারের বিরুদ্ধে ধর্মীয় মৌলবাদকেই প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। তাদের মতামত সম্পূর্ণ একপেশে এবং ধর্মনিরপেক্ষতার পরিপূর্ণ বিরোধী।

প্রশ্ন : ভারতীয় সংস্কৃতিই কি হিন্দু সংস্কৃতি?

উত্তর : একটি দেশের ভাষা-সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা-শিক্ষা-স্থাপত্য-গবেষণা-ক্রীড়া প্রভৃতি সামগ্রিক জীবনচর্চাই সেই দেশের সংস্কৃতি। ভারতীয় সংস্কৃতি একটি সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গঠিত হয়েছে। এটা কখনই ধর্মমিশ্রিত সংস্কৃতি নয়। আর্য-অনার্য, শক-হুন-পাঠান-মোগল প্রভৃতি গোষ্ঠীর মিলিত জীবন-অনুশীলনের মধ্য দিয়েই আজকের এই ভারতের সংস্কৃতি রচিত হয়েছে। এই অখণ্ড সংস্কৃতির গর্ভেই ভারতীয়তাবোধ জন্মলাভ করেছে। এই সম্পদ কোনও একটি জাতি গোষ্ঠীর সম্পদ নয়। এটি বহু ধারা-উপধারার একটি মিলিত স্রোত। যারা এই সত্যকে বিকৃত করতে চায়, ইতিহাসে তারা ক্ষমার অযোগ্য।

প্রশ্ন : বাংলাদেশ থেকে যে অনুপ্রবেশ ঘটছে— এতে ভারতের বিপদ কি বাড়ছে না?

উত্তর : অনুপ্রবেশ মাত্রেই অবৈধ। যে কোনও দেশেই অনুপ্রবেশ ঘটুক না কেন, সেই দেশের সমস্যার চাপ তা বাড়িয়ে তুলবে, এটাই ঘটনা। যুদ্ধবিগ্রহ, দাঙ্গা, গৃহযুদ্ধ, স্বৈরশাসন থেকে নিস্তার পেতে দুর্ভোগ সত্ত্বেও অনেকে বিদেশে পালিয়ে আশ্রয় নেয়। গোটা ইতিহাসে তা ঘটেছে, আজও ঘটে চলেছে। বাংলাদেশ থেকে ভারতে যখন হিন্দু অনুপ্রবেশ ঘটে, তাকে বিজেপি'র ভাষায় বলা হয় শরণার্থী। মুসলমান অনুপ্রবেশ হলে তাকে বলা হয় অনুপ্রবেশকারী। উভয়ের চরিত্র মূলত এক। কিন্তু এই সত্যকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না যে, প্রধানত ব্যাপক স্বৈরতান্ত্রিক আক্রমণ, মানবাধিকার হরণ বা চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থাই সেই দেশের নাগরিকদের একটি অংশকে ভারতে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য করে। ঐ দেশের জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ হিন্দু। জনসংখ্যার প্রায় ৯০ শতাংই মুসলমান। পাকিস্তানী সামরিক শাসনের অত্যাচারে বা তীব্র আর্থিক সঙ্কটের চাপে পড়ে পেটের ক্ষুধা দূর করতে অনেকে দেশত্যাগী হয়ে ভারতে আসে। এই ঘটনার সাথে কোনও ধর্মীয় চক্রান্ত যুক্ত নয়। আমাদের দেশের স্বার্থেই চেষ্টা করতে হবে যাতে সীমান্ত অতিক্রম করে কোনও অনুপ্রবেশ না ঘটতে পারে— তা সে যে ধরনের অনুপ্রবেশকারীই হোক না কেন। এ দায়িত্ব মূলত কেন্দ্রীয় সরকারের। এর সাথে মৌলবাদীদের প্রচারের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না।

সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের জন্য অনুপ্রবেশের সমস্যা প্রধান ও সংকটজনক না হওয়া সত্ত্বেও তাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচারে নিয়ে আসা হচ্ছে।

আসামে বিজেপি পরিচালিত সরকার ক্ষমতায় আসার পরে 'অনুপ্রবেশ' প্রশ্ন নিয়ে সঙ্ঘ পরিবার দেশজুড়ে মিথ্যা প্রচারের বন্যা বইয়ে দেয়। নাগরিকদের জাতীয় রেজিষ্টার তৈরি সুপ্রিম কোর্টের তত্ত্বাবধানেই হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্ট যে পদ্ধতি অনুসরণ করার কথা বলে আসছে, সঠিকভাবে নির্ধারিত পদ্ধতি মেনে তার সবটা কার্যকর হচ্ছে না। এতে অনেক গলদ থেকে যাওয়ার ফলে প্রথম খসড়ায় ৪০ লক্ষ বসবাসকারীর নাম স্থান পায়নি। প্রত্যন্ত জায়গার অনেক গরিব অজ্ঞ মানুষ কাগজপত্র তৈরি করতে চরম হয়রানির সম্মুখীন হচ্ছেন। বেশ কিছু ব্যক্তি ও পরিবার বহু বছর আটক রয়েছে। ৪০ লক্ষের মধ্যে শেষ পর্যন্ত ৩৬.২০ লক্ষের আবেদন জমা পড়েছে। বিতর্ক ও

সংশয় এখনও বিরাজ করছে। খসড়া তালিকায় নাম নিয়ে আপত্তি জানিয়ে আবেদন জমা পড়েছে প্রায় ৩.৫ লক্ষ। ত্রুটিপূর্ণ নামগুলি ঝাড়াই বাছাই করে আপত্তির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২ লক্ষের মতো। সমস্ত দাবি ও আপত্তির যথাযোগ্য নিষ্পত্তি করে ৩১শে জুলাই, ২০১৯-র মধ্যে আসামে নাগরিকদের জাতীয় রেজিস্টার প্রকাশিত হবে। কোন অবস্থাতেই এই সময়সীমা পরিবর্তন হবে না বলে সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে। ইতিমধ্যে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এনে প্রতিবেশি দেশগুলি থেকে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের অবাধে নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বিজেপি এবং তার সরকার ঘোষণা করেছে। এই রেজিস্টার চূড়ান্তভাবে তৈরি এবং সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদনের আগেই বিজেপি-র সভাপতি দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে এই দাবি তুলে প্রচারে নেমে যান যে ৪০ লক্ষ আসামবাসী অনুপ্রবেশকারী। এর বিরুদ্ধে এবং বিলের বিরুদ্ধে আসামে আবার হিংসাত্মক ঘটনা ছড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকরা হেনস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও তার আগে অনেকে ভারতে আশ্রয় নেয়। পশ্চিমবঙ্গ, আসামে জনসংখ্যাও বাড়ে জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশি। ১৯৭১ সালের পর জাতীয় গড়ের চেয়ে এই দু'রাজ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার বাড়েনি বরং কমেছে। রাজনৈতিক স্বার্থে অনুপ্রবেশের সমস্যাকে বড়ো করে দেখানো হচ্ছে।

প্রশ্ন : রাজনৈতিক দল ও ধর্মের মধ্যে কি সম্পর্ক বাঞ্ছনীয়?

উত্তর : রাষ্ট্র যেমন হবে ধর্মনিরপেক্ষ— দেশের সকল রাজনৈতিক দলকেও হতে হবে আদর্শ ও নীতিগতভাবে সম্পূর্ণভাবে অসাম্প্রদায়িক। কোনও ধর্মীয় আবেগকেই কোনও রাজনৈতিক দল ব্যবহার করতে পারবে না। ভারতের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন (১৯৫১)-এ সেই কথা সুস্পষ্টভাবে বলা আছে। যে কোনও রাজনৈতিক দলে যে কোনও ধর্মের মানুষ থাকতে পারে। তার মধ্যে যদি কেউ ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান করতে চায়— তা হবে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। আবার কেউ আদৌ কোনও প্রচলিত ধর্মীয় আচরণ নাও করতে পারে। যে কোন রাজনৈতিক দলের কর্তব্য হল কোন্ আর্থিক-সামাজিক নীতির মাধ্যমে তারা দেশের ও দেশবাসীর কল্যাণ করতে চায়–তা প্রচার করা। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সুযোগ পেলে তাকে কার্যকরি করা। সেখানে যদি কোনও রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে ধর্মীয় উন্মাদনার সৃষ্টি করা হয়— তাহলে

দেশবাসীর আর্থিক-সামাজিক প্রশ্নগুলি চাপা পড়ে যায়। কেবল তা নয়, বলা যায় দেশ ও জনজীবনের সমস্যার প্রশ্নগুলি চাপা দিতেই সংকীর্ণ ভোটস্বার্থে আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ধর্মের সঙ্গে রাজনীতি ও সরকারকে মেশানো হয়। এতে ক্ষতি হয় জনগনের ঐক্য-সংহতি, দুর্বল হয়ে পড়ে দেশ, ব্যাহত হয় আর্থিক-সামাজিক বিকাশ। দেশবাসীর কোনও মঙ্গল সাধিত হয় না। তাই রাজনৈতিক দল ও ধর্ম হবে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কহীন বিষয়। সাম্প্রদায়িক ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থ যাদের নেই, তারা এর সঙ্গে একমত হয়ে সেই নীতি বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর করবে।

প্রশ্ন : বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত বর্তমান বিতর্কের সমাধানের পথ কি?

উত্তর : অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও বহু ধর্মের বহু ধর্মীয় স্থান আছে। মন্দির, মসজিদ, গুরুদ্বার, গির্জা, বৌদ্ধবিহার প্রভৃতি আছে। আরও যদি কোনও ধর্মীয় স্থান কেউ গড়তে চায়— তা গড়তে পারে— কোনও প্রকার বাধা দেওয়া যাবে না। কিন্তু একটি ধর্মীয় স্থানকে ভেঙে অন্য এক একটি ধর্মীয়স্থান করা বিদ্বেষমূলক।

কোনো অজুহাতেই এই ধরনের কার্যকলাপ বরদাস্ত করা যায় না। সেজন্য বাবরি মসজিদকে অক্ষত রেখে ভিন্ন জায়গায় এক বা একাধিক মন্দির করা যেত। কিন্তু তা না করে বাবরি মসজিদকে ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয়েছে। ঐ ইমারত এবং তার স্থান নিয়ে যখন বিতর্ক— তখন বিবাদী পক্ষগুলির মধ্যে আলাপ-আলোচনার সাহায্যে কোনও ঐকমত্যে পৌঁছানো যদি যেত তাহলে সব থেকে ভালো হতো। সেই অনুসারে কাজ হতো। দেশে কোনও অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটতো না। এভাবে যদি কোনো সিদ্ধান্তে আসা না যায়— তাহলে একমাত্র পথ থাকে এই সম্পর্কিত সকল বিচারাধীন মামলা সব কোর্ট থেকে সংবিধানের ১৩৮(২) ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টে স্থানান্তরিত করা। কেন্দ্রীয় সরকারই পারে এ ধরনের উদ্যোগ নিতে। তাহলে সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দেবে— সব পক্ষকেই তা মেনে নিতে হবে— মেনে নেওয়া উচিত। বাবরি মসজিদ ভেঙে দেওয়ার পরেও এখনও সকল বিবাদী পক্ষকে আলোচনায় বসা উচিত— স্থির সমাধানের রাস্তা বের করা উচিত। কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের ১৪৩(১) ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্টের কাছে রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে যে পরামর্শ চেয়েছে তাতে সমাধানের কোনও সন্ধান পাওয়া

যাবে না— অবস্থা আরও জটিল হবে। একমাত্র বিকল্প পথ ১৩৮(২) ধারা অনুযায়ী সমগ্র বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের কাছে বিচারের জন্য পেশ করা এবং সকল ধর্মের ঐকমত্য সৃষ্টি করা।

২০১৮ নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন শুরু হবার মুহূর্তে আর এস এস-বিশ্ব হিন্দু পরিষদসহ সঙ্ঘ পরিবার বাবরি মসজিদের ভগ্নস্তূপের ওপর রামমন্দির তৈরি করতে মোদী সরকারকে অর্ডিন্যান্স জারি করার দাবি তোলে। সুপ্রিম কোর্টে এই বিষয়ে মামলার তোয়াক্কা না করে এবং সুপ্রিম কোর্টকে অগ্রাহ্য করতে তারা মোদী সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। সরকারের জন্য বোঝাপড়া করেই এই চাপ ও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বলে মোদী এবং কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রশ্নে নীরব থাকে। ২০১৯'র ১লা জানুয়ারি একটি টিভি চ্যানেলের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেই দিয়েছেন, বিচারবিভাগীয় প্রক্রিয়ার পর সরকার রামমন্দির বানাতে সব চেষ্টা গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকবে। আর এস এস এজন্য প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানিয়েছেন। এটা সুপ্রিম কোর্টকে অবজ্ঞা করারই নামান্তর। মোদীর উক্তির সারার্থ হলো, সুপ্রিম কোর্টের রায় যাই হোক না কেন, সরকার রামমন্দির নির্মাণের জন্য সহায়তার ব্যবস্থা করবে। অথচ নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালে সংবিধান এবং আইনের শাসন মেনে চলবেন বলে শপথ নিয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন, সংসদকে 'গণতন্ত্রের মন্দির' আখ্যা দিয়ে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে সংসদ ভবনে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পা রেখেছিলেন। এখন পরিষ্কার বোঝা যায়, দ্বিচারিতাই এদের অনুসৃত প্রিয় নীতি। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র মোদী সরকার এবং সঙ্ঘ পরিবারের কাছে সবসময় তুচ্ছ।

প্রশ্ন : মুসলিমরা 'বিদেশী' এটা কী সত্য?

উত্তর : আর এস এস এবং হিন্দুত্ববাদীরা সবসময় প্রচার করে আসছে যে প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে ভারত বরাবর একটি জাতি ছিল। অষ্টম শতাব্দীতে পৃথিবীর উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল থেকে মুসলমান হানাদাররা আসায় ভারত পরাধীন হয়। মহম্মদ বিন কাশিম থেকে মুঘল সাম্রাজ্য সবই বিদেশী শাসন।

দেশী বনাম বিদেশী এভাবেই প্রধানমন্ত্রী ২০১৪ সালে নির্বাচনে জয়ের পর ঐতিহাসিক বিকৃতি ঘটিয়ে বিষয়টিকে উত্থাপন করে বলেছিলেন ১২০০

বছরের দাসত্বের অবসান হয় ১৯৪৭ সালে এবং হিন্দু জাতি হিসেবে ভারত স্বাধীনভাবে আত্মপ্রকাশ করে।

ব্রিটিশরা অবশ্যই বিদেশী যারা লুটের জন্য ভারতকে পদানত করে এবং প্রায় দু'শো বছর ভারতীয় সম্পদ লুট ও ভারতীয় জনগণের ওপর শোষণ নির্যাতন চালায়। অবশেষে পরিস্থিতি ও স্বাধীনতা আন্দোলনের চাপে তারা ভারতকে সর্বস্বান্ত করে দেশ ছেড় চলে যায়, ভারত স্বাধীন হয়। কিন্তু যে মুসলিম সম্রাটরা মুঘল রাজত্ব চালায় তারা ফিরে যায়নি, ভারতের সঙ্গেই মিশে যায়, এটাই তাদের বাসভূমি ও বংশধরদের জন্মভূমি হয়ে ওঠে। ১২০০ বছর এভাবে চলার পর প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এরা ভারতবাসী। কিন্তু এরা সকলে সঙ্ঘ পরিবারের সংজ্ঞায় 'বিদেশী'। মুসলমান সম্রাটদের আগে অনেক বিদেশী যেমন শক, হুণ, কুষাণরাও বিদেশ থেকে আসে। বহু এলাকায় শাসন করে। তারাও মিশে যায় ভারতে, লুট করে বিদেশে নিয়ে যায়নি।

সব ইতিহাস-গবেষণার অভিন্ন বক্তব্য এবং অকাট্য সত্য যে, আর্যরা বিদেশ থেকে বহু শতাব্দীজুড়ে এদেশেই এসেছে, নানা বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে এদেশেই তারা মিশে বিলীন হয়ে গেছে। জীবন ও বংশস্রোতে আদিম ভারতীয় পরিচয় বহন করে আছে আদিবাসীরাই। আর্যরা কী বিদেশী ছিল না? এ প্রশ্নের উত্তর আরএসএস-র নেই। গায়ের জোরে বলে থাকে আর্যরা বিদেশ থেকে আসেনি। আর্যরা বিদেশী এই সত্যকথা বললে সঙ্ঘ পরিবারের ধর্মীয় মতাদর্শের ভিত্তিই যে ভেঙ্গে পড়ে।

২০১১ সালের ৫ই জানুয়ারি বিচারপতি মার্কন্ডেয় কাটজু এবং বিচারপতি জ্ঞানসুধা মিশ্রকে নিয়ে গঠিত সুপ্রিম কোর্টের একটি বেঞ্চ আদিবাসী সংক্রান্ত একটি মামলায় যে রায় দিয়েছে, তা এক ঐতিহাসিক দলিলের মতো। তাতে বলা হয়েছে, ভারত মূলত প্রাচীন অভিবাসীদের (বিদেশ থেকে আগমনকারী) দেশ। প্রাক্-দ্রাবিড়দের পূর্বেকার আদিবাসীরাই বর্তমান আদিবাসীদের পূর্বপুরুষ। দ্রাবিড়দের আগে তারাই ভারতের মূল বাসিন্দা। অভিবাসীদের বংশধররাই ৯২ শতাংশ, আদিবাসীরা ৮ শতাংশ। উত্তর আমেরিকাও অভিবাসীদের দেশ, কিন্তু তারা নতুন অভিবাসী। ভারতে হল প্রাচীন অভিবাসী। ১০ হাজার বছর ধরে এরা এসেছে, মূলত এসেছে ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব দিক থেকে। এতরকম অভিবাসীদের এদেশে

এসে মিশে যাওয়ার ফলে ভারতে ভাষা সংস্কৃতিসহ সবকিছুতে এত বৈশিষ্ট্য। এটা মনে রেখেই সংবিধান তৈরি করা হয়েছে। আর্যদের প্রাচীন অভিবাসী বলা হলে হিন্দুত্বের গোটা কাঠামোটাই ভেঙ্গে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এ কারণে আর্যদের প্রাচীন ও মূল বাসিন্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য হিন্দুত্ববাদীরা আদিবাসীদের কখনই আদিবাসী বলে না, আদিবাসীদের সবসময়েই তারা বলে বনবাসী।

হিন্দু মৌলবাদীরা বা হিন্দুত্ববাদীরা তাদের জন্মলগ্ন থেকে প্রচার করে আসছে যে, বিদেশ থেকে এসে মুসলমান শাসকরা ৮০০ থেকে ১৭০০ সালের সময় পর্বে হিন্দুদের হত্যা করেছে, ধর্মান্তকরণ করেছে, হিন্দু মহিলা ও শিশুদের ক্রীতদাস বানিয়েছে এবং হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছে। অথচ প্রকৃত ইতিহাস অন্যরকম।

এই প্রচারের জন্য 'বিদেশী' প্রচারটা সবসময়ই বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য পরিকল্পিতভাবেই করা হচ্ছে।

ভারতে ইসলামের সূত্রপাত হয় ৬২২ সালে। তখন স্বেচ্ছায় কেরালার রাজা চেরামান পেরুমল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। অর্থাৎ ৭১৫ সালে মহম্মদ বিন কাসিম ভারতে হানা দেবার প্রায় একশ' বছর আগে। পেরুমল ছিলেন শূদ্র রাজা যিনি ৬২২ সালে হজরত মহম্মদের কাছে যান এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। পৃথিবীর প্রথম মুসলমান যেমন হজরত মহম্মদ, ভারতে ঠিক তেমনই প্রথম মুসলমান পেরুমল। কেরালার ত্রিসূর জেলার মেথালায় ৬২৯ সালে স্থাপিত চেরামান জামা মসজিদ এখনও বিরাজ করছে। দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য জায়গাতেও এরকম পুরনো মসজিদ আছে। নতুন জ্ঞান ও 'আত্মার মুক্তি'র অন্বেষণ করতে কঠিন পথ অতিক্রম করে পেরুমল সৌদী আরবে গিয়েছিলেন। সুলতানী ও মুঘল রাজত্বের প্রত্যক্ষ শাসন ছিল উত্তর প্রদেশ, বিহার ও দাক্ষিণাত্যে। কিন্তু এসব সহ অন্য অনেক জায়গায় অতীতের মতো মুসলিমদের সংখ্যা কাশ্মীর, অবিভক্ত বাংলা ও পাঞ্জাবের তুলনায় আজও কম। ট্যাক্স এড়ানোর জন্য মুসলিম হয়েছে এরকম সংখ্যা নগণ্য। দূরবর্তী প্রান্ত যেখানে মুঘল রাজত্বের দাপট ছিল অতি দুর্বল সেখানেও ইসলামের প্রভাব দেখা যায়। বৈশ্য শূদ্রদের ওপর উচ্চবর্ণের হিন্দুদের অত্যাচারেও অনেকে মুসলিম হয়েছে। বিবেকানন্দও এরকম একটা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। অকৃষি, অ-হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেককে কৃষিতে যুক্ত করা হয় এবং মুসলিমদের

প্রবর্তিত নতুন কৃষি পদ্ধতি তারা ব্যবহার করে। এ কারণেই তাদের ধর্ম পরিবর্তনের এটা একটা কারণ হতে পারে।

প্রাচীন বা মধ্যযুগে বৃহৎ আকারে জোরজবরদস্তি ধর্মান্তকরণ হলে তা বিচ্ছিন্ন ও নেহাতই কম এবং শাসকবর্গ তা পরিকল্পিত অভিযানে করেছে। মন্দির, বৌদ্ধ মন্দির, মসজিদ, গীর্জা হয়েছে। ধর্মীয় আনুগত্য কখনোই আকস্মিক ও সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়নি, এত ধীরগতিতে ও দীর্ঘমেয়াদে তা হয়েছে, তা বোঝা ও পরিমাপ করা দুষ্কর। এমন কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ইতিহাসে পাওয়া যায়নি, যেখানে বিরাট আকারে জোরজবরদস্তিতে কোন ধর্মান্তকরণ হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী শাসকরা খ্রীস্ট জন্মের আগে এবং পরে কয়েক শতাব্দী ধরে ধর্মান্তকরণ অভিযান করেছে এমন কোন নজির ইতিহাসে নেই। তাই যদি হতো, তাহলে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা আজ কয়েক কোটি হতো। ২০১১ জনগণনা অনুসারে ভারতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মানুষের সংখ্যা মাত্র ৮৪ লক্ষ, মোট জনসংখ্যার ০.৭ শতাংশ। বাড়েনি জৈন ধর্মাবলম্বীর সংখ্যাও। ৮০০ বছর সুলতানী ও মুঘল রাজত্বেও যদি পাইকারী জোরপূর্বক ধর্মান্তকরণ হতো, তাহলে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হতো। জনগণের বিরুদ্ধে তারা শাসন-শোষণ চালিয়েছে, সেটাই ছিল তাদের মূল লক্ষ্য। পরে তাদের বংশধররাও কেউ ভারত ছেড়ে যায়নি, ভারতই তাদের জন্মভূমি ও বাসভূমি। ব্রিটিশ শাসকরাও জোর খাটিয়ে ধর্মান্তকরণ করেনি, সেটা তাদের লক্ষ্যও ছিল না। দূরপ্রান্তের পিছিয়ে পড়া আদিবাসী গরিব এলাকায় মিশনারী কাজের মধ্য দিয়ে অনেকে খ্রীস্টান হয়েছে, যা আজও আছে।

ধর্মান্তকরণের বিষয়ে বিতর্ক সামনে আসে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে, হিন্দু মৌলবাদের উত্থানে। আর এস এস এবং হিন্দু মহাসভা প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই এই আওয়াজ ওঠে। ১৯০৯ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'হিন্দু : এক মুমূর্ষু জাতি' বইতে ইউ এন মুখার্জি ব্রিটিশ সরকারের জনগণনার তথ্য ও পূর্বাভাষকে চাতুর্যের সঙ্গে ব্যবহার করে মুসলিমদের সংখ্যাবৃদ্ধির তুলনায় হিন্দুসংখ্যা হ্রাস সম্পর্কে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য তুলে ধরেন। নিচু জাত ও সম্প্রদায়ের মানুষদের হিন্দু সমাজের দুর্বল স্থান বলে মুখার্জি উল্লেখ করেন। 'উত্তর ভারতে' আর্য সমাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে এই আশঙ্কা প্রচার করে এবং পিছিয়ে পড়া অংশের শুদ্ধি বা পুনরায় ধর্মান্তকরণের স্লোগান দেয়। এ নিয়ে সংগঠনও তৈরি হয়, এদের পাল্টা হিসেবে মুসলিমদের একটা অংশ

থেকে তকলিঘ ও তানঝিস আওয়াজ ওঠে। ১৯২০-র দশকের মাঝামাঝি হিন্দু-মুসলমান উত্তেজনা ও হিংসার তা প্রধান উৎস হয়ে ওঠে (সুমিত সরকার, হিন্দুত্ব ও ধর্মান্তকরণের প্রশ্ন')।

খ্রীস্টান ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে মনোভাব চাঙ্গা করতে সাভারকার ধর্মান্তকরণ প্রশ্নটিকে বেছে নিয়ে 'হিন্দু' সম্পর্কে সংজ্ঞা দেন যে যারা একসঙ্গে পিতৃভূমি ও পূণ্যভূমিকে মেনে নেয় তারাই 'হিন্দু'। এই সংজ্ঞায় মুসলিম ও খ্রীস্টানদের বিদেশী ও অ-দেশপ্রেমিক লেবেল দেওয়া সহজ হয়ে ওঠে। এই আগ্রাসী হিন্দু জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক মতাদর্শগত ভিত্তি নিয়েই ১৯২৫ সালে আরএসএস গঠিত হয় হিন্দু ও মুসলিম পৃথক জাতি আখ্যা দিয়ে এবং এর মধ্য দিয়ে দেশভাগের প্রথম স্লোগান তোলে আরএসএস। তাদের শত্রু হিসেবে চিহ্নিত করা হয় : খ্রীস্টান, মুসলিম ও কমিউনিস্টরা।

একমাত্র কমিউনিস্টরাই সব শ্রমজীবীদের ঐক্যের পক্ষে এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে— তা সে ধর্ম, জাত, বর্ণ, ভাষা, সম্প্রাদায়, লিঙ্গ যা-ই হোক না কেন। সব শ্রমজীবীদের ঐক্য কমিউনিস্টরা চায় পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। এ কারণে কমিউনিস্টরা হলো সঙ্ঘ পরিবারের শত্রু, মুসলিম ও খ্রীস্টান মৌলবাদীদেরও শত্রু। হিন্দুত্ব ও হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদের জন্য ফ্যাসিস্ট মতাদর্শী আরএসএস-র একটা কোন শত্রু চাই-ই; সেই শত্রু কমিউনিস্টরা ছাড়াও হলো ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা। ১৯৯৮-২০০৪ সালে বিজেপি-র পরিচালিত এন ডি এ সরকার অন্য দলগুলির ওপর নির্ভরশীল ছিল বলে সংখ্যালঘুদের মধ্যে মুসলিম সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার অপেক্ষেকৃত কম ছিল। সরকার গঠনের এক বছরের মধ্যে খ্রীস্টানদের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক অভিযান চালায় সঙ্ঘ পরিবার। অথচ খ্রীস্টান জনসংখ্যা দু-দশক ধরে অপরিবর্তিত ২-৩ শতাংশ। খুব সম্ভবত বিদেশী বহুজাতিক কোম্পানির স্বার্থে আগ্রাসী নয়া-উদারবাদী নীতি অনুসরণের কারণে দৃষ্টি ঘোরাতে বাজপেয়ী সরকার বিদেশী ধর্ম হিসেবে ভারতীয় খ্রীস্টানদের ওপর এই আক্রমণের বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করে। অতীতে ধর্মান্তকরণের অভিযোগ তুলে আদিবাসী খ্রীস্টান, গির্জা ও খ্রীস্টান সন্ন্যাসিনীদের ওপর হিংসাত্মক অভিযান চালায় হিন্দুত্ববাহিনী। প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী এসব বর্বর ঘটনার নিন্দা না করে প্রশ্ন জিইয়ে রাখতে এ বিষয়ে জাতীয় বিতর্কের ডাক দেন। ব্যর্থ বাজপেয়ী সরকারের সময়ে উপায়হীন মোদীর গুজরাট দেখল

২০০২ সালে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের জন্য সংখ্যালঘু-বিরোধী দাঙ্গা। এ ক্ষত বয়ে চলতে হচ্ছে দেশকে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার সনদের ১৮ নম্বর ধারায় ধর্মমত পরিবর্তনকে মানবাধিকার হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। ''প্রত্যেকেরই অধিকার রয়েছে চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেক ও ধর্মের; এই অধিকার তার ধর্ম বা বিশ্বাস পরিবর্তনের স্বাধীনতা দেয়। এই ঘোষণার ভিত্তিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিশন 'নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের ওপর আন্তর্জাতিক চুক্তির খসড়া তৈরি করে, যা আইনত বাধ্যতামূলক চুক্তি'। তাতে বলা হয়, 'কাউকে জোরজবরদস্তি করা যাবে না যাতে কোন ধর্মমত পোষণ বা কোন ধর্মমত গ্রহণ করা বা তাদের পছন্দমাফিক বিশ্বাস মেনে চলার স্বাধীনতা বিনষ্ট হয়'।'' ১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মানবাধিকার কমিটি এই ধারার সঙ্গে একটি সাধারণ মন্তব্য জারি করে যে, আস্তিকতা, যে কোনও ধর্ম গ্রহণ করা, পরিবর্তন করা বা নাস্তিকতা মেনে চলার অধিকারের ওপর কারও হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই। তাতে নিষিদ্ধ করা হয় শারিরীক শক্তির হুমকি বা বিশ্বাসীদের বিশ্বাস পরিবর্তন, রূপান্তর বা পুনর্বিবেচনার জন্য, অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস করানোর জন্য শাস্তিমূলক নিষেধাজ্ঞার ব্যবহার সহ যে-কোন রকমের জোরজবরদস্তি।

আরএসএস-বিজেপি এসবের ধার ধারে না। সংবিধান, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সনদ, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনের নীতিনির্দেশকে লঙ্ঘন করার ফতোয়া তাদের কথায় ও কাজে সবসময়েই প্রকাশ পায়।

২০১৪ সালে মোদী সরকার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ক্ষমতায় এলে ধর্মান্তকরণ ইস্যু তুলে পুনঃধর্মান্তকরণ বা পুনরায় ঘরে ফেরা অভিযান চালায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ও সঙ্ঘ পরিবার। মুসলিম মৌলবাদীরাও তাদের শ্লোগানে হিন্দু সাম্প্রদায়িকদের রসদ জোগায়। পরস্পর পরস্পরের রসদের উৎস।

প্রশ্ন : গো-রক্ষা নিয়ে এত আপত্তি কেন?

উত্তর : উত্তর প্রদেশের দাদরিতে নিরীহ মুসলিম মহম্মদ আখলাখের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে হিন্দুত্ববাহিনীর অজুহাত ছিল আখলাখ গোমাংস ভক্ষণ করেছিল। এই নৃশংসতায় গোটা দেশ শিউরে ওঠে। গোহত্যাকে ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এ ধরনের নৃশংস ঘটনা গত ৩-৪ বছরে অনেকগুলি ঘটেছে।

এ রকম নৃশংস আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের পক্ষে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কেন্দ্রের শাসকদলের নেতাদেরও দাঁড়াতে দেখা যায়। এই হিন্দুত্ববাহিনীর দাবি হলো বেদ-এ গোমাংস ভক্ষণ ছিল নিষিদ্ধ এবং তার জন্য মৃত্যুদন্ডের বিধান ছিল। এমনও দাবি করা হয় যে ভারতে বহিরাগত মুসলিমদের আগমনের আগে ভারতে গোমাংস ভক্ষণের প্রচলন ছিল না। প্রাচীন ভারতে গো-মাংস ভক্ষণ করা হতো। ঋগ্বেদেও তার উল্লেখ আছে। বৈদিকযুগে বলদগরু ভক্ষণের চল ছিল। অতিথি আপ্যায়নে ও উচ্চ মর্যাদার ব্যক্তিদের সম্মান জানাতে স্ত্রী গরু কাটা হতো। বৈদিকযুগকে ভারতীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগ বলে অনেক সময় আখ্যা দেওয়া হয়। সুকুমারী ভট্টাচার্য গবেষণালব্ধ ফল থেকে লিখেছেন, 'সব দেশে সব কালে যেসব অপরাধ চলে এসেছে তার অনেকগুলিই ঋগ্বেদে উল্লেখ করা হয়েছে। হিংসা, স্বার্থপরতা, প্রতিহিংসাপরায়ণতা, শঠতা, আতিথ্যের ও আশ্রিতবাৎসল্যের অভাব, চুরি, ডাকাতি, খুন সবই তখনও ছিল।' ফলে অতীত সম্পর্কে যে কল্পকথা তারস্বরে প্রচার করা হয়, তা এসব অজস্র তথ্য প্রমাণের মধ্য দিয়ে অসার ও অসত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিন্দুত্ববাদীদের আরো একটা যুক্তি হলো পাকিস্তান যদি ধর্মীয় কারণে শূয়রের মাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ করে ভারত কেন গোহত্যা, গোমাংস রাখা ও ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ করবে না? এই অপযুক্তির আসল অর্থ হলো পাকিস্তান ঐশলামিক রাষ্ট্র হলে ভারত কেন হিন্দুরাষ্ট্র হবে না? গোহত্যা নিয়ে বিভিন্ন রাজ্যে নির্দিষ্ট আইন আছে। হিন্দুত্ববাহিনীর দাবি রাজ্যগুলির আইনসমূহ বাতিল করে একটা জাতীয় আইন প্রণয়ন করে যেকোন গবাদি পশু হত্যা নিষিদ্ধ করতে হবে এবং এই আইনে গোমাংস ভক্ষণ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে হবে।

ভারতে সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেমব্লিতে এই প্রশ্নে তুমুল বিতর্ক হয়। কিছু সদস্য দাবি তোলে সারা দেশে গোহত্যা সাংবিধানিকভাবে নিষিদ্ধ করা হোক। এর বিরুদ্ধেও জোরালো মতামত ব্যক্ত হয়। সবাই জানেন আম্বেদকার জাতভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। দলিতদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করার পেছনে নানা কারণের মধ্যে আম্বেদকার অন্যতম একটি কারণ চিহ্নিত করেন যে যেহেতু দরিদ্র দলিতরা গাভীসহ মৃত গবাদি পশুর মাংস খায় সেজন্য উঁচুজাতের লোকরা তাদের অস্পৃশ্য বলে গণ্য করে। তাঁর মতে উঁচুজাতের লোকরা ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানে

হিন্দুত্বকে প্রবিষ্ট করার উপায় হিসাবে গোহত্যা নিষিদ্ধ করার দাবি তুলছে। তীব্র বিতর্কের মধ্যে আম্বেদকার একটা আপসের রাস্তা উদ্ভাবন করেন। এই আপস রফা সংবিধানের নির্দেশাত্মক নীতির ৪৮ নম্বর ধারায় লিপিবদ্ধ করা হয়, কিন্তু সংবিধানের মূল কাঠামোর মধ্যে তাকে তিনি জায়গা দেননি। আম্বেদকারের আপস রফায় ধর্মীয় প্রবণতাকে বাদ রাখা হয়েছে। এই নির্দেশাত্মক নীতিতে 'গোমাংস ভক্ষণ'-কে উল্লেখই করা হয়নি। বলা হয়েছে: ''আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পথে রাষ্ট্র কৃষি ও প্রাণিসম্পদকে সংগঠিত করার চেষ্টা করবে। রাষ্ট্র বিশেষত বংশবৃদ্ধি বিকাশ এবং গাভী, বাছুর, অন্যান্য দুধ দেওয়া ও ভারবাহী গবাদি পশুর হত্যা নিষিদ্ধ করার জন্য পদক্ষেপ নেবে।'' হিন্দুত্ববাহিনী সংবিধানের এই নীতিকে উল্টে দিতে চায়। এই সাংবিধানিক নীতি উল্টে দেবার অভিযানের বিরোধিতার অর্থ কেবল সংখ্যালঘুদের জন্য নয়, কেবল কৃষক দলিত ও গরিবদের জীবনজীবিকা রক্ষা করার জন্যও নয়, এই বিরোধিতার মানে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বানানোর অভিযানের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতের লড়াইয়ের অংশ।

গত ডিসেম্বরের শেষে এবং ২০১৯ জানুয়ারির প্রথমে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকরা বেওয়ারিশ গরুর উৎপাতে অস্থির হয়ে উঠেছে। আলিগড়ে একটি স্কুলের গেট ভেঙ্গে ৮০০ গরুকে ঢুকিয়ে রাখে কৃষকরা। কয়েকদিন পর আগ্রায় একই ঘটনা ঘটে। শাহজাহানপুরে ২রা জানুয়ারি'র রাতে বেওয়ারিশ গরু স্কুলে ঢুকিয়ে রাখার জন্য ২৮জনকে পুলিশ আটক করে। দেশজুড়ে বাড়ছে এই গরুর সংখ্যা।

২০১২ সালে সর্বশেষ প্রাণীসম্পদ দপ্তর বেওয়ারিশ গরুর গরুগণনা করেছিল। তাতে বলা হয়, প্রায় ৫২ লক্ষ বেওয়ারিশ এরকম মালিকহীন গরু আছে। এরপর গণনা হয়নি, ছ-বছরে বেড়েছে আগের বৃদ্ধির হারের চেয়ে বেশি। যেহেতু গো-হত্যা নিয়ে কয়েকটি রাজ্যে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা, খুন ও দেশজোড়া আতঙ্ক তৈরি করা হয়েছে, এভাবে চললে ভবিষ্যতে এ সমস্যা মারাত্মক আকার ধারণ করবে।

কৃষিতে দ্রুতহারে যন্ত্রের ব্যবহার বাড়ছে। এতে দ্রুত ফুরোচ্ছে বলদ বা ষাঁড়ের ব্যবহার। ভারবহনের জন্য গরুর গাড়ি দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে, এখন আছে নামমাত্র কিছু। এসব অনুৎপাদনকারী গাভী, ষাঁড় ও বলদকে গো-পোষকরা পরিত্যাগ করে রাস্তায় ছেড়ে দেয়। গো-শালা ও গো-সংরক্ষণের জন্য

আশ্রয়স্থল আছে ১৮২১টি, যেগুলি ভারতের পশুরক্ষা পর্ষদের নথিভুক্ত। আনুমানিক ৫০০০ এরকম গো-শালা আছে, কিন্তু তার কোন উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ নেই। অযত্ন, খাদ্য ঘাটতি ও চিকিৎসার অভাবে গো-শালায় গরু মৃত্যুর ঘটনা বেড়ে চলেছে। একটি গরু দুধ দেয় ৩ থেকে ১০ বছরের মধ্যে। বাঁচে ২০ থেকে বড়জোর ২৫ বছর। দুধ না দিলে গো-পালকরা গরু বেচে দেয়। যারা কেনে তারা নিয়ে যায় কসাইখানায়। এদের সংখ্যা মোট স্ত্রী গরুর ১ থেকে ৩ শতাংশ। পশ্চিমবঙ্গ ও বিভিন্ন রাজ্যে আইন আছে ১৪ বা ১৫ বছরের বেশি বয়সের গরুকেই একমাত্র অনুমতি নিয়ে কসাইখানায় পাঠানো যাবে। তা কার্যকরও হয়। বিজেপি শাসিত রাজ্যে অকেজো বা অনুৎপাদী গরু না পুষলেও শাস্তির বিধান বলবৎ।

২০১২ সালে ১৯ কোটি ছিল গবাদি পশু। গো-হত্যা নিষিদ্ধকরণ কার্যকর হলে ২০২৭ সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ৩৬ থেকে ৪০ কোটি। অনুৎপাদী হবে বিরাট সংখ্যায়। বিশেষজ্ঞদের হিসেবে, মোষের দুধের দামের চেয়ে গরুর দুধের দাম অনেক বৃদ্ধি পাবে। কোটি কোটি গরিব মানুষের গো-পালনের মতো জীবিকা নিঃশেষ হতে থাকবে। শাস্তির ভয় নেই তাদের, যারা গোরুর কারণে কোন লোককে পেটায়, জখম করে বা হত্যা করে। ফলে, এই উন্মত্ত বাহিনীর ভয়ে কেউ গরু পুষবে না। কমতে কমতে উধাও হবে গরু। থাকবে মোষ, যেগুলি গরুর চেয়েও বেশি দুধ দেয়। এই অবস্থা চলতে দিলে রপ্তানি বাণিজ্য ছাড়াও ডেয়ারী, চর্ম, ওষুধ ও বিভিন্ন রাসায়নিক শিল্প মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

২০১৩-১৪ সালে ১৩.৮০ কোটি টন দুধ উৎপাদন হয়। দেশের মোট দুগ্ধ উৎপাদনের ৫১ শতাংশ এসেছিল মহিষ থেকে, ২০ শতাংশ দেশী গাভী থেকে, ২৫ শতাংশ শংকর জাতীয় গরু থেকে। ২০১৫ সালে আখলাখের হত্যার পর দুগ্ধ, মাংস ও চামড়া রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ২০১৫ সালে ভারত ২৪ লক্ষ টন গো-মাংস রপ্তানি করেছে। এই রপ্তানিতে ব্রাজিলের পর ভারত শীর্ষে (মোট বাজারের ২০ শতাংশ ভারত)। মাংস শিল্পে ২.২০ কোটি লোকের কর্মসংস্থান রয়েছে। এখন বিপদের মধ্যে এই শিল্প, ফলে কর্মসংস্থানও দ্রুত কমছে। অকাজের গরু রাখতে মাসিক খরচ প্রায় ৮ হাজার টাকা, বিজেপি শাসিত মধ্যপ্রদেশ এসব গরুর মাথাপিছু মাসিক ভর্তুকি ৫০০ টাকা। ফলে, রাতের অন্ধকারে দূরে এসব গরু কৃষকরা ছেড়ে দিয়ে বাঁচে।

গ্রামীন ভারতে কোটি কোটি পরিবারের জীবিকা গো-পালন। সংকটের মুখে পড়ছে এই জীবিকাও।

সবদিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় গো-রক্ষা নিয়ে সাংবিধানিক নীতিই মেনে চলা দরকার। এই নীতির বিরুদ্ধে হিন্দুত্বের ফরমান মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনবে।

প্রশ্ন : নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু ও ভগৎ সিং সম্পর্কে বিজেপি উচ্ছ্বসিত, তা নিয়ে কেন বিতর্ক উঠছে?

উত্তর : যেহেতু বিজেপি-র চালিকাশক্তি আর এস এস স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি এবং হিন্দু মহাসভা বিভিন্ন প্রশ্নে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিভেদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিল, এখন বিজেপি নিজেকে জাতিয়তাবাদী বলে প্রমাণ করতে নেতাজি, ভগৎ সিং এবং আরো অনেককে তাদের অনুগামী বলে প্রচারে নেমেছে। ভগৎ সিং সোচ্চারে বলেছিলেন, দেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করার জন্য কেন তিনি নাস্তিক। ব্রিটিশদের দেওয়া প্রাণদণ্ডে ফাঁসির দড়ি গলায় পড়ার আগে তিনি ধ্বনি তুলেছিলেন 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' অর্থাৎ 'বিপ্লব জিন্দাবাদ', যে বিপ্লবের ঘোরতর শত্রু আর এস এস এবং সঙ্ঘ পরিবার। ভগৎ সিং ছিলেন আর এস এস'র মৌলবাদী মতবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে আর এস এস বা হিন্দু মহাসভার সমর্থক বলে প্রচারের চেষ্টা হচ্ছে। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের— সভাপতি থাকাকালীন ১৯৩৯ সালে সুভাষ চন্দ্র বসু সাম্প্রদায়িক সংগঠন হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের সদস্যদের কংগ্রেসের সদস্য করার বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিলেন। ১৯৩৪ সালেও ওই দুই সাম্প্রদায়িক সংগঠনের বিরুদ্ধে তিনি কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। ১৯৪০ সালেও হিন্দু মহাসভার বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় তিনি সমালোচনা করেন যা সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছিল।

প্রশ্ন : নেহরু প্যাটেলকে প্রধানমন্ত্রী হতে দেননি, প্যাটেল আর এস এস'র অনুগামী ছিলেন এগুলি কি সত্য?

উত্তর : দেশভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা লাভের পর নেহরুকে প্রধানমন্ত্রী

করার বিষয়ে প্যাটেলের পূর্ণ সমর্থন ছিল। নেহরু সম্পর্কে প্যাটেলের অভিমত, ''জাতির প্রতিমূর্তি'', ''জনগণের বীর'' এবং ''জনগণের নেতা''। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নেহরুকেই বেছে নিয়েছিলেন গান্ধীজী। প্রথম প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ প্যাটেলের ছিল না, কারণ তিনি ১৯৫২ সালে সাধারণ নির্বাচনের আগে ১৯৫০ সালের ১৫ ডিসেম্বর প্রয়াত হন। গান্ধীজী হত্যার পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্যাটেলই আর এস এস'কে নিষিদ্ধ করে বিবৃতি দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : তৃণমূল কংগ্রেস কি ধর্মনিরপেক্ষ বা সেক্যুলার দল?

উত্তর : তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মই হয়েছে বিজেপি এবং সঙ্ঘ পরিবারের সঙ্গে জোট বাঁধার জন্য। এই জোট বেঁধে বিজেপি পরিচালিত এনডিএ শরিক হিসেবে ছ-বছর কেন্দ্রীয় সরকারে মন্ত্রিত্ব করেছে। এ ছ-বছর খ্রীস্টন ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে দাঙ্গা, গুজরাট দাঙ্গা, সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও মেরুকরণের বিরুদ্ধে কোন ভূমিকা নেয়নি। এই ভূমিকা আজ অবধি তৃণমূল কংগ্রেস বজায় রেখেছে। উপরন্তু মোদী সরকারের সময়ে দেশজুড়ে গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার ওপর একটানা আক্রমণের বিরুদ্ধে নীতিগত কোন অবস্থান তৃণমূল কংগ্রেস নেয়নি। এ রাজ্যে আর এস এস এবং সঙ্ঘ পরিবারের বাড়বাড়ন্তের সুযোগ করে দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। সঙ্ঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক অভিযানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সশস্ত্র রামনবমী উদ্‌যাপন, হনুমান জয়ন্তী, গোদান, ব্রাহ্মণসেবাসহ সব কার্যকলাপ রাজ্যের শাসকদল করে। সাম্প্রদায়িক প্রতিযোগিতার কারণে হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধে, গান্ধীহত্যা ও অন্যান্য প্রসঙ্গে এবং মুসলিম মৌলবাদ সম্পর্কে তৃণমূল কংগ্রেস নিশ্চুপ থাকে। মোদী সরকারের বিরুদ্ধে কিছু বিদ্রোহের বাগাড়ম্বর এই দল করে থাকে, স্বার্থপরতা ও নিছক ভোট-জোটের দিকে লক্ষ্য রেখেই। ভয়ঙ্কর ফ্যাসিস্ট শক্তি আর এস এস'র সম্পর্কে তৃণমূল কংগ্রেস নানা সময় সপ্রশংস অবস্থান নিয়েছে। আর এস এস'ও তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি সবসময় সহানুভূতিশীল। উভয় মৌলবাদ এবং তাদের আদর্শগত অবস্থানের সঙ্গে নিজেদের পার্থক্য তুলে ধরতে কোন স্পষ্ট বক্তব্য এই দলের নেই। গণতন্ত্র-বিরোধী ও বাক্ স্বাধীনতা খর্বকারী স্বৈরশাসক হিসেবে কাজ করে তৃণমূল কংগ্রেস। এই দল সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী কঠোর অবস্থান নিতে অক্ষম। এই চরিত্রের কারণে তৃণমূল কংগ্রেস মৌলবাদ-সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে আপসকামী।

প্রশ্ন : ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র হলে কী মানুষের সমস্যার সমাধান হবে?

উত্তর : ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র অতীতে ছিল। বিজ্ঞানের আবিষ্কারকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দিয়ে বিজ্ঞানীদের ওপর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অবর্ণনীয় নির্যাতন হয়েছিল। মৃত্যু পর্যন্ত কঠোর শাস্তি পেতে হয়েছে গ্যালিলিও, রোমে পুড়িয়ে মারা হয়েছে ব্রুনোকে। ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্বের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর সভ্য দেশেও অনেক আক্রমণ হয়েছে, এখনও হচ্ছে। সক্রেটিসের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাঁর উন্নত শিক্ষা তাঁর যুগের সংস্কারের বিরুদ্ধে এবং রাষ্ট্রের আরাধ্য দেবতাদের বিরুদ্ধে যুবকদের উস্কানি দিয়ে বিপথে চালিত করছিলেন এবং গ্রীসের এথেন্স হেমলক বিষ পান করিয়ে তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। রজার বেকন, ভেসালিয়াস, কোপারনিকাসের অনুগামী কেপলার, ইহুদিদের দ্বারা ইহুদি সিপ্পোনোজা, এমন কি নিউটনও নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। নির্যাতন ছাড়া কোন মহান সত্য বা তত্ত্ব জনমানসে প্রবেশ করতে পারেনি। এখনও এই ধারা বিরাজমান। মোলবাদ ও পুনরুজ্জীবনবাদ এখনও দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সন্ত্রাসবাদ। ভারতের হিন্দু মৌলবাদীরা আঙুল তোলে ইসলাম ধর্ম ও ঐশ্লামিক রাষ্ট্রগুলির দিকে এবং তার ভিত্তিতে হিন্দু মৌলবাদী জিগির ও উন্মাদনা তৈরি করছে। মুসলিম মৌলবাদীরা গণতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে ধর্মীয় শাসনের উগ্র প্রচার করে থাকে।

৪৯টি দেশে মুসলিমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, কিন্তু সবগুলি ঐশ্লামিক রাষ্ট্র হিসেবে ধর্মীয় অনুশাসনে চলে না। যেমন বলা যায়, ইসলাম ধর্মকে রাষ্ট্র ও সংবিধানের আদর্শগত ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে সৌদী আরব, ইরানসহ ৬টি দেশ। ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে গ্রহণ করেছে ২০টি দেশ; তার মধ্যে পাকিস্তান, বাংলাদেশও আছে। ২৩টি দেশে রাষ্ট্রের সঙ্গে ধর্ম পৃথক : তার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া ৫টি দেশ, তুরস্ক, লেবানন, নাইজেরিয়া ও সেনেগালের মত দেশ আছে।

কিন্তু মানব উন্নয়ন সূচকে ঐশ্লামিক রাষ্ট্রগুলি পিছিয়েই রয়েছে। ধনী-দরিদ্রের বৈষম্য প্রকট। শোষণ-অত্যাচার বেশি ছাড়া কম নয়। স্বাধীনতার সাতদশক পরও অনুর্ধ ৫ বছরের শিশুদের অপুষ্টি শতাংশের হিসেবে : ভারত ৩৮.৭, পাকিস্তানে ৪৫ এবং বাংলাদেশ ৩৬। মাথাপিছু দারিদ্রের হার জনসংখ্যার শতাংশের হিসেবে (দৈনিক ৩.১০ ডলার আয়ের ভিত্তিতে) : ভারতে ৫৮, পাকিস্তানে ৩৬.৯, বাংলাদেশে ৫৬.৮।

দেশের অগ্রগতি ও মানুষের অবস্থার উন্নতি কখনোই ধর্মীয় শাসনের ওপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে অনুসৃত আর্থিক নীতির ওপর। রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে ইসলামকে গ্রহণ করে এক ইঞ্চিও এগোয়নি পাকিস্তান বা বাংলাদেশ, বরং পিছিয়েছে। শোষণ-অত্যাচার, হিংসা, সন্ত্রাসবাদে জর্জরিত এই দেশগুলি। আর্থিক সামাজিক অপশাসনকে আড়াল করতে সব রঙের মৌলবাদীরা ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য স্বৈরাচারী আওয়াজ তোলে। এই অনুশাসন গণতান্ত্রিক রীতিনীতি ও জনগণের মৌলিক অধিকারের সম্পূর্ণ বিরোধী। যার লক্ষণ সব মৌলবাদীদের ঘোষিত প্রচারে, কার্যকলাপে এবং সার্বিক অভিজ্ঞতায় সুস্পষ্ট।

প্রশ্ন : আডবানি এবং বিজেপি নেতারা সমসময় বলে থাকেন যে গান্ধীজীর হত্যাকারী নাথুরাম গড্‌সে'র সঙ্গে আর এস এস'র কোন সম্পর্ক ছিল না!

উত্তর : ১৯৯৪ সালের ২৮শে জানুয়ারি নাথুরাম গডসে'র, ছোট ভাই গোপাল গডসে'র সঙ্গে এক সাক্ষাৎকার প্রকাশ করেছে 'ফ্রন্টলাইন' পাক্ষিক পত্রিকা। তাতে গোপাল গডসে যা বলেছেন: ''আমি আডবানির এ কথার বিরোধিতা করেছি এবং বলেছি যে এরকম বলাটা কাপুরুষোচিত। আপনি বলতে পারেন, 'যাও, গান্ধীজীকে খুন করো', এরকম কোনো প্রস্তাব আর এস এস পাশ করেনি। কিন্তু ওকে (নাথুরাম) পরিত্যাগ করবেন না। হিন্দু মহাসভা তাকে পরিত্যাগ করেনি। ১৯৪৪ সালে নাথুরাম হিন্দু মহাসভার কাজ শুরু করে যখন সে ছিল আর এস এস'র 'বোদ্ধিকরায়ভ'। আমাদের সকল ভাইরা ছিলাম আর এস এস-এ। নাথুরাম, দত্তাত্রেয়, আমি এবং গোবিন্দ। আপনারা বলতে পারেন আমাদের বাড়ির চেয়ে বরং আমরা আর এস এস-তেই বড় হয়েছিলাম। আমাদের কাছে আর এস এস পরিবারের মতো।''

প্রশ্ন : জাতীয় পতাকা কেন তেরঙ্গা?

উত্তর : ভাষা, বিশ্বাস, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে ভারতের বিরাট এক সমৃদ্ধ বৈচিত্র্য। এ কারণে সংবিধান প্রণয়নের জন্য গঠিত কনস্টিট্যুয়েন্ট অ্যাসেম্বলি জাতীয় পতাকা হিসেবে তেরঙ্গাকে বেছে নেয়। আর এস এস দাবি করে তেরঙ্গার বদলে জাতীয় পতাকা হোক গেরুয়া (আর এস এস মুখপত্র

'অর্গানাইজার'র সম্পাদকীয়, ১৭ জুলাই, ১৯৪৭)। এ বছরের ১৪ই আগস্ট এই মুখপত্রে তেরঙ্গা পতাকার বিরোধিতা করে লেখা হয় : ''ভাগ্যবশত যেসব লোক ক্ষমতায় এসেছে তারা আমাদের হাতে তেরঙ্গা ধরিয়ে দেবে। কিন্তু সেটাকে কখনই হিন্দুরা সম্মান জানাবে না এবং নিজেদের বলে মেনে নেবে না। 'তিন' শব্দটিই অশুভ এবং তেরঙ্গা একটি পতাকা নিশ্চয়ই স্নায়বিক প্রভাব তৈরি করবে এবং যা একটি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।''